মে ২০২৫ ■ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

# নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

## আমার মা

মিছবাহুল জান্নাত নাবা, প্লে শ্রেণি, নতুনকুড়ি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জামালপুর

তামজিদ হোসেন, সপ্তম শ্রেণি, পূর্ব রামপুরা হাই স্কুল, রামপুরা, ঢাকা

# সম্পাদকীয়

পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। শ্রমজীবী মানুষের দাবি আদায়ের দিন। ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকদের আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে শ্রমিকের ৮ কর্মঘণ্টার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দিনটি তাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য 'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়ব এ দেশ নতুন করে'।

আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ৭ই মে। এছাড়াও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনও মে মাসের ২৪ তারিখে। প্রিয় দুই কবিকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে নবারুণের এ সংখ্যায় তাদের নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

পৃথিবীর সবচেয়ে আপন ও মধুর শব্দের নাম 'মা'। প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রোববার বিশ্বব্যাপী 'বিশ্ব মা দিবস' পালন করা হয়। সেই হিসেবে এ বছর ১১ই মে 'বিশ্ব মা দিবস'। তাই এই দিনে বিশ্বের সব মানুষের মতো আমরাও আমাদের মাকে নিয়ে মেতে উঠি। এ দিনে তো বটেই, জীবনভর সকল মায়ের প্রতি জানাই অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। মাকে নিয়ে মজার মজার গল্প-কবিতার সাথে রয়েছে আমাদের আরো অনেক আয়োজন। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে।

ভালো থেকো, আনন্দে থেকো, নবারুণের সাথেই থেকো।

**প্রধান সম্পাদক**
খালেদা বেগম

**সিনিয়র সম্পাদক**
রিফাত জাফরীন

**সম্পাদক**
ইসরাত জাহান

**সিনিয়র সহসম্পাদক**
শাহানা আফরোজ

**সহসম্পাদক**
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

**সহযোগী শিল্পনির্দেশক**
সুবর্ণা শীল

**অলংকরণ**
নাহ্‌রীন সুলতানা

**সম্পাদকীয় সহযোগী**
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

**যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা**
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
ই-মেইল :
editornobarun@dfp.gov.bd

**বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী**
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

**মুদ্রণ :** মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

# সূচি

## নিবন্ধ


০৩ মা দিবসের কথা/ কাজী আবু নাছের
২২ এক ইতিহাসের নাম/ মাহমুদুল হাসান খোকন
৩৩ রবির কিরণে জেগে ওঠা/ জসীম উদ্দীন মুহম্মদ
৩৬ ছোটোদের নজরুল/ প্রফেসর আবদুল মান্নান
৪৩ মা পাখিদের কথা/ রুবাইয়াত খান
৫১ এভারেস্ট জয়ী ৭ বাংলাদেশি/ মো. মাহবুব আলম


## গল্প


০৬ মা গাছ/ মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী
১১ মায়ের জন্য ভালোবাসা/ আহমেদ টিকু
১৫ সবুর মিয়ার দুরন্তপনা/ জসীম আল ফাহিম
১৯ আমার মা/ নুরুল ইসলাম বাবুল
২৫ মে দিবসের ছুটিতে/ সুজন বড়ুয়া
৩১ একটি হাতুড়ি/ খান সাকিব-উল হুসেন
৪৫ বিড়ালের কীর্তি/ ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ
৪৮ নীলু এবং এক আঁজলা জল/ সুবর্ণা দাশ মুনমুন


## প্রতিবেদন


৫৩ বজ্রপাতে করণীয়/ রেজাউল করীম
৫৫ গ্রীষ্মকালীন রোগে সাবধানতা/ মো. জামাল উদ্দিন
৫৬ গরবিনি মা সম্মাননা/ জান্নাতে রোজী
৫৭ পাখিদের দ্বীপ/ নাহিদ ইয়াছমিন লাইজু
৫৮ দশদিগন্ত/ ফাতেমা জেসমিন রীমা
৬০ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ


## কবিতাগুচ্ছ


০৫ আনোয়ারুল ইসলাম/ ফরিদ সাইদ
০৯ সজীব মালাকার
১০ নার্গিস আক্তার
১৮ মো. মনিরুজ্জামান মনির
২৪ গোলাম নবী পান্না
২৯ আবু রুশদা/ রেজাউল করিম
৩০ মাহফুজ বাবুল
৩৫ আসাদুজ্জামান খান মুকুল/ কাজল নিশি


## ছোটোদের ছড়া


১০ মোবাশ্বিরা আক্তার বিথি
১৩ মানতাকা তাবাস্‌সুম পৃথিবী
১৪ তানভীর আহমেদ সায়েম/ মেশকাউল জান্নাত
৩০ ফারহান খান


## আঁকা ছবি


দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মিছবাহুল জান্নাত নাবা/ তামজিদ হোসেন
তৃতীয় প্রচ্ছদ : নুহা আলম/ রোজমিলা রহমান
শেষ প্রচ্ছদ : রুমাইজা শারওয়াত
৬১ শোয়েব হোসেন
৬২ আবু সালেহ/ তাসনিম জাহান রাদিয়া
৬৩ মোহাম্মদ ইউসুফ অর্ক/ মো. রাকিবুল ইসলাম
৬৪ সিরাজুম মুনিরা বিভা/ সাইমুম আহমেদ



**নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে**

*Nobarun Potrika*

*www.dfp.gov.bd*

# মা দিবসের কথা

কাজী আবু নাছের

'মা' একটি ছোট্ট শব্দ। কিন্তু এই শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সব মায়া, মমতা-দরদ, অকৃত্রিম স্নেহ, আদর, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সব সুখ।

চাওয়া-পাওয়ার এই পৃথিবীতে মায়ের ভালোবাসার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। মায়ের তুলনা মা নিজেই। মায়ের মতো এমন মধুর শব্দ অভিধানে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও বিজ্ঞানের এই যুগে মায়ের ভালোবাসার গভীরতা পরিমাপের কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি। তিনি যেন অনন্ত মমতা, সীমার মাঝে অসীম। মা আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রিয় মানুষ। তার ভালোবাসা, ত্যাগ এবং স্নেহের কোনো তুলনা হয় না।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মায়ের অবদান অমূল্য এবং অবিস্মরণীয়। তিনি সন্তানের জন্যে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেন। মাকে ভালোবাসতে বা সম্মান জানাতে কোনো একটা দিনের দরকার হয় না। জীবনের প্রতিটি দিনই 'মা দিবস'।

বন্ধুরা, মা দিবস হলো পৃথিবীর সকল মায়েদের প্রতি সম্মান জানানোর একটি বিশেষ দিন। কারণ পৃথিবীতে সকল কিছুর মূল্য পরিশোধ করা হলেও মায়ের ভালোবাসা, স্নেহ, মাতৃত্ববোধের কখনো দাম দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এই অমূল্য সম্পর্ককে সম্মান জানাতে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব মা দিবস। প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার 'বিশ্ব মা দিবস' পালন করা হয়। দিনটি পৃথিবীতে যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে পালিত হয়ে আসছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভার্জিনিয়ায় অ্যান নামে এক সমাজকর্মী ছিলেন। তিনি নারী অধিকার নিয়ে কাজ করতেন। সেজন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'মাদারস ডে ওয়ার্ক ক্লাব'। ছোটো ছোটো ওয়ার্ক ক্লাব তৈরি করে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করতেন। অ্যান ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ। অ্যানের একটি মেয়ে ছিল, যার নাম আনা মারিয়া।

মেয়ের সামনেই অ্যান বলেছিলেন- 'আমি প্রার্থনা করি, একদিন কেউ না কেউ, মায়েদের জন্য একটা দিন উৎসর্গ করুক। কারণ তারা প্রতিদিন মনুষ্যত্বের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন। এটি তাদের অধিকার।' মায়ের সেই প্রার্থনা হৃদয়ে নাড়া দেয় আনার। মায়ের মৃত্যুর পর আনা মারিয়া মায়ের শান্তি কামনায় ও তার সম্মানে সরকারিভাবে মা দিবস পালনের জন্য প্রচারণা চালান। তিন বছর পর ১৯০৮ সালের ১০ই মে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার আন্দ্রেউজ মেথডিস্ট এপিসকোপাল চার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম মা দিবস পালিত হয়।

এরপর ১৯১২ সালে এই দিবসটিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। এই প্রচার ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কানাডা, মেক্সিকো, চীন, জাপান, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায়। প্রচারণার ধারাবাহিকতায় ১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে 'মা দিবস' ঘোষণা করেন। এরপর থেকে প্রতিটি দেশে মায়েদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার আন্তর্জাতিক মা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে নানা আয়োজনে মা দিবস পালিত হয়ে থাকে। ❑

*প্রাবন্ধিক*

## কবিতায় মা

# মায়ের স্মৃতি

**আনোয়ারুল ইসলাম**

মাগো তুমি কোথায় আছো
কোন দেশেতে ঘুমে-
মাটির ঘরে মাটি হয়ে
তালাবদ্ধ রুমে?

ওই ঘরেতে মাটি ছাড়া
নেই যে কিছু আর
অবুঝ ছেলে দু-চোখ মেলে
পায় না দেখা তোমার।

দূর দেশেতে ছদ্মবেশে
থাকো কেন দূরে?
এই সুদূরে আমায় রেখে
হৃদয় পুড়ে পুড়ে।

আদর স্নেহ মায়ার কথা
কল্পনাতেই ভাসে
স্মৃতি হয়ে সবার মাঝে
মা দিবসে আসে।

# জননী

**ফরিদ সাইদ**

মা যে আমার আসমানি সুখ
অন্ধকারের তারা
মনের ব্যথা কেউ বোঝে না
মা জননী ছাড়া।

দুঃখ জ্বালা বুকে চেপে
হাসি ফোটান মুখে
ভালোবেসে মা আমাদের
রাখেন চির সুখে।

আদর-স্নেহ ভালো-মন্দ
মা বলে দেন আগে
দিন-দুনিয়ার সকল কাজে
মায়ের দু'আ লাগে।

জান্নাতি সুখে এই মায়েদের
মাবুদ ভালো রেখো
রহমতের নজর দিয়ে
সারাজীবন দেখো।

গল্প

# গাছ মা

## মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী

আমার যে মা নেই এটা বাবা আমাকে বিশ্বাস করতে দেয় না। জোছনা রাতে ছাদে নিয়ে গিয়ে বাবা আমাকে চাঁদ দেখাবে। আর চাঁদের আশেপাশে ঘুরতে থাকা তারাগুলোকে দেখাবে। তারাগুলোকে দেখিয়ে বলবে, তোমার মা ওইখানে তারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরে ঘুরে তোমাকে আমাকে দেখছে। বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারিনি, কেন মা ওখানে ঘুরে বেড়াবে আমাদেরকে ছেড়ে!

আমার কান্না করতে ইচ্ছে করে। আমি কান্না করি না। আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে লাভ কী। আমি ক্লাস টু-এ পড়ি। সব বুঝি। মা একদিন খুব অসুস্থ হলো। এরপর ঘুমিয়ে গেল। কোনোভাবেই আর জাগলো না। সবাই মিলে মাকে কবর দিয়ে আসলো। তবুও আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং বাবাকে বুঝতে না দেওয়ার

জন্য বাবার সাথে মাঝে মাঝে ছাদে যাই তারা দেখতে। অবশ্য আর একটা জায়গায় গোপনে গোপনে আমি মাকে খুঁজতে যাই। সেটা অবশ্য কাউকে বলি না।

মায়ের অনেকগুলো কথা আমার মনে পড়ে। সেগুলো এখন আমি পালন করি অক্ষরে অক্ষরে। মা বলত, নাবিলা কোনো দুষ্টুমি করবে না। ভদ্র হয়ে চলাফেরা করবে। তবুও আমি প্রচুর দুষ্টুমি করতাম। দুষ্টুমিতে আমার যেন সীমা নাই। মা বলত, নাবিলা ভালো করে পড়াশুনা করবি। আমি পড়াশুনা করতে বসলে একটা দুইটা বাক্য পড়ে আম্মুকে জ্বালাতাম। বলতাম, আম্মু আমার পড়া হইছে। কিন্তু আসলে আমি ভালোভাবে পড়াশুনা করতাম না। পড়াশুনায় বসলে আমার খালি খেলার কথা মাথায় আসত। আমি

যে ভালোভাবে পড়াশুনা করতাম না তার একটা চার্ট তোমাদেরকে বলি।

স্কুলের মাসিক অগ্রগতির শিটে শেষের দুইটি কলাম আছে। যার একটিতে লেখা শ্রেণিতে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর। পরের কলামে আছে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর। শ্রেণিতে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বরের কলামে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও পরিবেশ বিজ্ঞানে ৫০-এ ৫০ পেয়েছে। আর আমি বাংলায়-৪২, ইংরেজিতে- ৪৫, গণিতে-৪৮ আর পরিবেশ বিজ্ঞানে ৪১। তাহলে দেখো আমার পড়াশুনার কী অবস্থা।

এখন আম্মু নেই। আম্মুকে এখন কেমন করে বলি, আম্মু এখন সত্যি সত্যি আমি কোনো দুষ্টুমি করি না। গুরুজনদের সালাম দেই। আমি এখন নিয়মিত পড়াশুনা করি। গত দুটি মাসিক পরীক্ষায় সব বিষয়ে আমি ৫০-এ ৫০ পেয়েছি। আমি ক্লাসে প্রথম হয়েছি। মা বলত, সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আমি সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি। দাদা-দাদির কথা, বাবার কথা, ফুপির কথা, চাচ্চুর কথা।

আম্মু যখন ছিল তখন আম্মুসহ একটা বাগান করেছি। বাগানে বিভিন্ন ফুলের গাছ লাগানো। আমি সবুজ বাগান খুব পছন্দ করি। মা একদিন বলেছিল, নাবিলা, তুমি মাটির নিচে যে-কোনো কিছু পুঁতে দাও না কেন, তা একসময় গাছ হয়ে উঠে দাঁড়াবে। সবুজ সবুজ গাছ। সেই থেকে আমার নেশা ধরে গিয়েছিল। এজন্য আমি সবুজ সবুজ গাছ ভীষণ পছন্দ করি। আর কোনো কিছু পেলেই মাটির নিচে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা করি।

একদিন আমি মাটিতে একটা শিমের বিচি পুঁতে দিলাম। সেটা কয়েক দিন পরেই মাটি ফেটে উঠে দাঁড়ালো। বিচিটা না। একটা সবুজ গাছ। সবুজ

গাছটা টকটকে সবুজ রঙের। এরপর আর একদিন একটা কাঁঠাল বিচি মাটিতে পুঁতে দিলাম। সেটাও কয়েকদিন পর সবুজ একটা গাছ হয়ে বেরিয়ে এল। এরপর আমি আর একদিন অনেকগুলো কালো রঙের বিচি কুড়িয়ে আনলাম। দাদিকে দেখালাম। দাদি বলল, ওগুলো সন্ধ্যা মালতি ফুলের বিচি। সেগুলো পাশাপাশি একসঙ্গে পুঁতে দিলাম। কিছুদিন পর সেগুলোও গাছ হয়ে মাটি ফেটে বেরিয়ে এল। সবগুলো গাছের যত্ন নিতে শুরু করলাম। গাছগুলো সবুজ রং দিয়ে ভরিয়ে দিল চারপাশটা। একসময় সন্ধ্যামালতি গাছগুলোতে পিংক কালারের ফুল ধরল। ফুলে ফুলে ভরে গেল বাগান।

মাটিতে কোনোকিছু পুঁতে দিলেই সবুজ সবুজ গাছ হয়ে মাটি ফেটে উঠে তা তো আমি দেখেছি। মাকে যেদিন মাটির নিচে কবর দেওয়া হলো সেদিন আমি খুব কেঁদেছি। আমার কান্না দেখে সবাই আরও বেশি বেশি করে কেঁদেছিল। কয়েকদিন পর আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। আমি কল্পনা করতে শুরু করলাম যে মাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে একটা সবুজ গাছ বের হবে। সেই গাছে কোনো ফল হবে না। সেই গাছটি হবে আমার মা। মা গাছ থেকে আবার আমাকে শাসন করবে। আবার আমাকে ভালোবাসবে।

কিন্তু সবকিছু মাটিতে পুঁতে দিলেই যে গাছ হয়ে বের হয়ে আসে না তাও আমি বুঝতে পারছি ধীরে ধীরে। কিন্তু এই কথাটা আমাকে মা বলে যায়নি। বলে গেলে কি আর আমি অপেক্ষা করি।

মায়ের কবরের জায়গাটাতেই আমি গোপনে গোপনে আসি। আজকেও সকালে এসেছি। না এখনো মাটি ফেটে কোনো সবুজ রঙের গাছ বের হয়নি। আমি সেই সবুজ মা গাছটার অপেক্ষায় থাকি। আমার কেন জানি মনে হয় একদিন এই মাটি ফেটে মা গাছটা বড়ো হতে শুরু করবে। ❑

---

অর্থ ও হিসাব বিভাগ, জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, জীবিতা প্রকল্প, রংপুর

# মা

## সজীব মালাকার

ঘুম ভাঙে রোজ সকালবেলা
আমার মায়ের ডাকে,
মা আমাকে সারাটা দিন
যত্ন স্নেহে রাখে।

সারাটা দিন সুখেই থাকি
মায়ের আঁচল পাশে,
শান্তি আমি পাই যে তখন
মা যখনই হাসে।

মা সারাক্ষণ কষ্ট করেন
আমার সুখের জন্য,
এই ধরাতে মায়ের আদর
হলো যে অনন্য।

# মা

## নার্গিস আক্তার

আমার ছোটোকাল ছিল ভালো
মায়ের আদর মাখা
যখন-তখন বায়না ধরতাম
মায়ের আঁচল পাতা ।

মায়ের মুখের ভাষা সে যে
মধুর চেয়ে দামি
মায়ের আদর স্নেহ মায়া
সোনার চেয়ে দামি।

মা যে আমার দুঃখ-কষ্টের
স্বপ্ন সুখের আশা
মায়ের শাড়ির আঁচল খানি
সকল ভালোবাসা।

যতই বলো আপন আপন
মায়ের সমান নেই
আরশি বল পড়শি বল
মায়ের মতন নেই।

# পরিশ্রমী মা

## মোবাশ্বিরা আক্তার বিথি

আমার মায়ের কাজের নেই শেষ,
রান্নাঘরেই সময় কাটান বেশ।
আমার জামা, আমার খাতা,
সবকিছুতেই মায়ের মাথা।

মাকে দেখেই বুঝি আমি,
শ্রম মানেই ভালোবাসা।
কাজ করে যে হাসি পায়,
তার জীবনে নেই হতাশা।

মা যে আমার গর্বের থলি।
মা আমার চোখের মনি
মা মানেই শ্রেষ্ঠ তুমি,
তোমায় পেয়ে ধন্য আমি।

*[ দশম শ্রেণি, নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা ]*

গল্প



# মায়ের জন্য ভালোবাসা

আহমেদ টিকু

রিনি আর টিনি দুই বোন। এক সাথে মায়ের কোলে এসেছে। তাই সবাই ওদের বলে যমজ বোন। ওরা একসাথে খায়-দায়। এক সাথে খেলে। এক সাথে ঘুমায়। একই সাথে স্কুলে যায়। দুজনেই তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। ওরা খুবই ভালো। মা-বাবার কথা শোনে। কারও সাথে ঝগড়া করে না। মিথ্যে কথা বলে না। সহপাঠীদের বিপদে এগিয়ে আসে। সবাই ওদের ভালোবাসে।

একদিন শিক্ষক ক্লাসে মানুষের জীবনে মা-বাবার অবদানের কথা বলছিলেন। বলছিলেন - মা-বাবা আমাদের পৃথিবীতে এনেছেন। ছোটো থেকে বড়ো করেছেন। তারা না-খেয়ে আমাদের খাইয়েছেন। না-পরে আমাদের পরিয়েছেন। রোগ শোক হলে রাত জেগে সেবা করেন। তাদের কারও অবদানই আমরা খাটো করে দেখতে পারি না। তবে আমরা মায়ের কাছেই বেশি ঋণী। আমরা যদি আমাদের শরীরের চামড়া দিয়ে জুতো বানিয়ে মায়ের পায়ে পরিয়ে দেই তবুও মায়ের ঋণ শোধ হবে না।

স্কুল ছুটি হলে ওরা বাড়িতে ফেরে। রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে। আজ ওরাও মা-বাবাকে নিয়ে কথা বলে। রিনি বলে দেখ টিনি মা-বাবা আমাদের জন্য কত্ত কষ্ট করে। বাবা রোজগার করে আনে। মা আমাদের রেঁধে-বেড়ে খাওয়ায়। আমাদের জামাকাপড় ধুয়ে দেয়। রোগ-বালাই হলে মা সারারাত জেগে সেবাযত্ন করে।

টিনি বলে, 'তবে মায়ের কষ্ট বেশি রে।'

-'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

-'নে আমরা আমরা মায়ের কিছু ঋণ শোধ করার চেষ্টা করি।'

-'কীভাবে ?'

-'মাকে একটা উপহার দিয়ে।'

-'দুর পাগলি! উপহার দিয়ে কি মায়ের ঋণ শোধ হয়!'

-'ঋণ শোধ ঠিক নয় । আমরা তাকে জানাতে পারি - মা, আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আমাদের বুকে তুমি আছ ভালোবাসার সিংহাসনে।

-'ব্যাপারটা দারুণ হবে।'

-'কিন্তু, আমরা তো ছোটো মানুষ উপহার কেনার টাকা পাব কোথায় ?'

-'শোন আজ থেকে আমরা দুজনের টিফিনের টাকা থেকে কিছুটা জমাবো আর কেউ উপহার দিলে সেই টাকাটাও জমাবো। মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মা দিবস। ওই দিন আমরা মাকে একটা উপহার কিনে দেব।

ওরা একটা মাটির ব্যাংক কিনে নিয়ে যায়। ধীরে-ধীরে টাকা জমাতে থাকে। দিন গড়িয়ে রাত আসে। রাত পেরিয়ে দিন। এভাবে সময় বয়ে যায়। চলে আসে মে মাসের এগারো তারিখ । পরদিন মা দিবস। ওরা দুইবোন চুপিচুপি বসে আলাপ করে। মাকে একটা শাড়ি উপহার দিবে।

-'কিন্তু, মায়ের কোন রং পছন্দ।

-'তুই কৌশলে জেনে নিস।'

-'আচ্ছা।'

মাটির ব্যাংকটা ভেঙে টাকাগুলো গুছিয়ে রাখে দুবোনে। স্কুলে যাবার সময় টিনি মাকে প্রশ্ন করে।

-'মা, তোমার কোন রং পছন্দ ?

-'কেন রে ?'

-'এমনিতেই। বলো না মা।'

-'হ্যাঁ, উদার নীল আকাশ আমার ভীষণ ভালোলাগে মা। তোদের বয়সে মনে হতো পাখি হয়ে ওই নীল আকাশে উড়ে যাই।'

-'ঠিক আছে মা, আমাদের স্কুলের সময় বয়ে যাচ্ছে, যাই।'

-'তাই যা, আমারও অনেক কাজ পড়ে আছে।'

স্কুল ছুটি হলে ওরা বাজারে রহমত চাচার দোকানে

শাড়ি কিনতে যায়। রহমত চাচা ওদের বাবার বন্ধু। ওরা এ দোকানে আগে বহুবার কাপড় কিনতে এসেছে। ওদের দেখে চাচা বলেন, এই যে, মা জননীরা - তোমরা একা ? মা-বাবা কই?

-'আমরাই এসেছি চাচা। মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনব।'

-'কোন রঙের শাড়ি ? মা-জননীরা বল।'

-'আকাশের মতো নীল রঙের একটা শাড়ি।'

-'আচ্ছা, আমি বুঝেছি মা।'

একটা নীল রঙের সুন্দর শাড়ি কিনে স্কুলব্যাগে লুকিয়ে ওরা বাড়ি নিয়ে আসে। পরদিন সকালে ওরা ঘুম থেকে ওঠে। পুব আকাশে সূয্যিমামা কিরণ ছড়াতে শুরু করেছে মাত্র। ঝির-ঝির করে হাওয়া বইছে। উঠানের পাশে ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে। মা বসে তরকারি কাটছেন। ওরা দুইবোন শাড়িটা হাতে নিয়ে চুপি-চুপি মায়ের পিছে গিয়ে দাঁড়ায়। এক বোন পেছন থেকে মায়ের চোখ চেপে ধরে। অন্য বোন বলে, 'মা হাত বাড়াও।' মা বটিটা কাত করে রেখে হাত দুটি প্রসারিত করে। মায়ের চোখ ছেড়ে দুজনে মায়ের দুইপাশে দাঁড়ায়। মা চোখ খোলেন। শাড়ি দেখে অবাক হন, তাও আবার তার প্রিয় নীল রঙের!

-'তোরা এটা কোথায় পেলি?'

-'আমরা তোমার জন্য কিনেছি মা। আজ মা দিবস। তোমাকে আমরা অনেক ভালোবাসি মা। আমরা অনেকদিন ধরে টাকা জমিয়ে তোমার জন্য এ উপহার কিনেছি । মা, তুমি খুশি হওনি?'

তখন মায়ের চোখে খুশির অশ্রু। মা বলেন, 'অনেক খুশি হয়েছি মা, তোরা অনেক বড়ো হ, ভালো মানুষ হ।' বলে দুবোনকে দুই কোলে টেনে নেন। ওরাও ছোটোবেলার মতো মায়ের কোলে মুখ লুকায়। মা ওদের পিঠে পরম মমতার পরশ বুলাতে থাকেন আর দোয়া করতে থাকেন। ❑

---

শিশুসাহিত্যিক

# মায়ের পরশ

## মানতাকা তাবাস্‌সুম পৃথিবী

মা, এই নামটি যে সবার চেনা,
কারণ এই শব্দটি সবার মুখে বোনা।
মা কত মধুর শব্দটি,
এটি শুনে জুড়িয়ে যায় সবার বুকটি।

মা, তুমি যে সবার চেয়ে মহান,
কেউই হতে পারে না তোমার সমান।
মায়ের চেয়ে আপন এমন কারে খুঁজে পাবে,
মায়ের কোলে মাথা রাখলে সকল যাতনা সরে যাবে।

সকলে মিলে রাখেন সন্তানের নাম,
কিন্তু মায়ের কাছে থাকে একটি স্নেহের নাম।
আমরা মনের কথা বলতে পারি মার কাছে,
কিন্তু মা মনের দুঃখ লুকিয়ে রাখে নিজের কাছে।
মায়ের চেয়ে ভালোবাসবে না আমাকে কেউ বেশি,
মা আমি তোমায় বড্ড ভালোবাসি।

*[ একাদশ শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা ]*

## ছোটোদের ছড়া

# আপনজন

### তানভীর আহমেদ সায়েম

মায়ের কাছে আমি
হই যে মানিক রতন
মা আমার এ জগতে
সবচেয়ে আপনজন।

মায়ের কাছে কথা শিখি
মায়ের হাতে খাই
মায়ের কোলে মাথা রেখে
পরম শান্তি পাই।

মাকে ছাড়া হয় না কিছু
শিশু-কিশোর বেলা
সব সময় থাকে সাথে
মায়ের দোয়া মেলা।

*[ অষ্টম শ্রেণি, কুর্মিটোলা হাই স্কুল, খিলক্ষেত, ঢাকা ]*

# মায়ের মুখ

### মেশকাউল জান্নাত

সবচেয়ে বেশি দামি
মায়ের হাসিমাখা মুখ,
তাঁর কাছে আছে মিশে
পৃথিবীর সব সুখ।

আদর করেন ডাকেন আমায়
করেন অনেক মায়া
বুকে টেনে নিয়ে মা
দেন ভালোবাসার ছোঁয়া।

ঘুমের সময় মাথায় তিনি
দেয় বুলিয়ে হাত
মায়ের দোয়ায় বিশ্বটাকে
করব বাজিমাত।

*[ ষষ্ঠ শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা ]*

গল্প

# সবুর মিয়ার দুরন্তপনা

জসীম আল ফাহিম

মোমেনা বিবি উঠোনে ছোটো একটা পিঁড়িতে বসে কুলায় চাল নিয়ে ঝাড়ছিলেন। শমসের আলীর দোকান থেকে কেনা চাল। দুই সের চালের মধ্যে অর্ধেকেই ধান মিশানো। কিছু কাঁকরও পাওয়া গেল। ধান আর কাঁকর বাছতে বাছতে একমাত্র পুত্র সবুর মিয়াকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'বাবা সবুর! তুই এত দুষ্টুমি করিস কেন?'

'দুষ্টুমি করি না তো মা। আমি তো ঠিকই আছি।' বলল সবুর মিয়া।

'ঠিক আছিস বলিস কেমন করে? সেদিন দারোগা বাড়ির ছেলে মন্টুর সাথে বিরাট ঝগড়া করে এলি। ওর বাপ তোর বিরুদ্ধে দুনিয়ার নালিশ করে গেল। এসবের মানে কী শুনি?'

'আমি তো ইচ্ছে করে ওর সাথে লাগতে যাইনি মা। গায়ে পড়ে সে আমার সাথে ঝগড়া করতে এল। ও আমাকে বলে কী মা–আমার বাবা নাকি খেয়াঘাটের মাঝি ছিল। আমি একজন মাঝির ছেলে। এমন কথা শুনলে কী কারও মনমেজাজ ঠিক থাকে মা, তুমিই বলো? আমি ওকে বেশি মারিনি তো মা। আস্তে করে শুধু ওর গালে একটা আঁচড় কেটে দিয়েছি। যাতে আঁচড়ের দাগটা ওর অনেকদিন মনে থাকে। আমাকে আর মাঝির ছেলে বলে না-ডাকে।'

‘তাই বলে অন্যের গায়ে তুই হাত তুলবি? এটা তোর ভারি অন্যায় হয়েছে। এক্ষুণি ভুল স্বীকার করে তুই মাফ চাইবি। নইলে আজ কিন্তু আমি অনেক রাগ হবো বলে দিচ্ছি।’ বলল মা।

সবুর মিয়া বুঝল মায়ের কাছে মাফ না-চাইলে আজ তার পেটে কিছু পড়বে না। তাই সে চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে দু-হাত জোর করে বলল, ‘এবারের মতো আমাকে তুমি মাফ করে দাও মা। আর কোনোদিন আমি কারও সাথে ঝগড়া করতে যাব না। কারও গায়ে হাতও তুলব না।’

হাসি চেপে মা বললেন, ‘মনে থাকে যেন কথাটা।’

তারপর মা সবুর মিয়ার জন্য ভাত বেড়ে দিলেন। সে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত খেতে থাকে। ভাত খেতে খেতে সে মাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা মা। মাঝি হওয়া মানে তো নৌকা চালানো। নৌকা চালানো কী খুব খারাপ একটা কাজ?’

ছেলের কথা শুনে মায়ের চোখে জল এসে গেল। ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন, ‘খারাপ কাজ হবে কেন রে বেটা? এটা তো একটা ভালো কাজ। সমাজসেবামূলক কাজ। এমন কাজ তো সমাজে আরও অনেকেই করে। এই যেমন ঝাড়ু দেওয়া। লোকের চুলদাড়ি কাটা। কাপড়চোপড় ইস্ত্রি করে দেওয়া। মাটি দিয়ে হাঁড়ি-পাতিল গড়া। লোহা গলিয়ে দা-বটি তৈরি। সবই তো ভালো কাজ। কোনোটাই কোনোটার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।’

‘তাহলে যে মন্টু সেদিন আমাকে বলল এগুলো ছোটোখাটো কাজ-কারবার।’

ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে করতে মা বললেন, ‘মন্টু মোটেই ঠিক কথা বলেনি রে বেটা। মন্টুর কথায় মনে হতে পারে–এগুলো ছোটোখাটো কাজ। কিন্তু আসলে কোনো কাজই ছোটো নয়। কোনো কাজকেই ছোটো করে দেখতে নেই। যে কাজ মানুষের উপকারে আসে, সেই কাজই উত্তম কাজ। মহৎ কাজ।’ মায়ের কথা শুনে সবুর মিয়ার মুখটা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বলল সে, 'আমার বাবা খেয়াঘাটে নৌকায় করে লোকজনকে নদী পার করে দিতেন। নদী পারাপার করে তিনি মানুষের উপকার করতেন। কাজটা আসলেই তো ভালো। বাবা একটা মহৎ কাজই করতেন! এখন থেকে কেউ আমাকে মাঝির ছেলে বললে আমি আর রাগ করব না মা।'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা।' খুশি হয়ে বললেন মা।

কিন্তু মনে যার সবসময় দুরন্তপনা বিরাজ করে, এত সহজে সে সুবোধ হওয়ার পাত্র নাকি? তাই পরদিনই সবুর মিয়া আরেকটা অঘটন ঘটিয়ে বাড়ি ফিরল। সেদিন মুনশি বাড়ির ছেলে পল্টু সেলুনে চুল কাটতে বাজারে যাচ্ছিল। পথে সবুর মিয়ার সাথে হঠাৎ তার দেখা। সবুর মিয়া পল্টুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কী রে পল্টু! কোথায় যাচ্ছিস?"

'বাজারে যাচ্ছি সবুর ভাই।' বলল পল্টু।

'হঠাৎ বাজারে কেন রে?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল সবুর মিয়া।

'আমার মাথার চুলগুলো কেমন লম্বা হয়ে গেছে দেখছ না। চুল কাটাতে বাজারে যাচ্ছি।' বলল পল্টু।

পল্টুর চুল কাটার কথা শুনে সবুর মিয়ার মনে কিছু একটা দুষ্টুমি হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। একটু চিন্তা করে সে বলল, 'আরে বেটা চুল কাটার জন্য সেলুনে যেতে হয় নাকি?'

'তাহলে কোথায় যাব?' জানতে চাইল পল্টু।

'এই দ্যাখ–আমার কাছে কাঁচি রয়েছে। চুল কাটার জন্য বাড়ি থেকে তোকে নিশ্চয়ই টাকাপয়সা দিয়ে দিয়েছে। টাকাটা তুই খরচ করিস না। পকেটে রেখে দে। টাকা দিয়ে পরে কিছু কিনে খাস। আয়, আমিই তোর চুলটা ছেঁটে দিই।' বলল সবুর মিয়া।

'তুমি ঠিক পারবে তো সবুর ভাই?' জানতে চাইল পল্টু।

'পারব না মানে, একশবার পারব।' বলল সবুর মিয়া।

সবুর মিয়ার কথা শুনে পল্টু নিজের মাথায় টোকা মেরে মেরে কী যেন ভাবনাচিন্তা করল। পরে সে বলল, 'ঠিক আছে সবুর ভাই। তুমিই তাহলে চুলটা কেটে দাও।'

সবুর মিয়া পল্টুকে নিয়ে বড়ো একটি আমগাছের তলায় গেল। পল্টুর বসার জন্য সে একটা পিঁড়িরও ব্যবস্থা করল। পিঁড়িতে বসে পল্টু তা না না না গান গাইতে শুরু করল। কিছু সময়ের মধ্যেই সবুর মিয়া খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে ওর মাথার চুলগুলো কেটে দিলো। তারপর মিটিমিটি হেসে বলল, 'নে বিনা পয়সায় তোকে একটা কদম ছাঁট দিয়ে দিলাম।'

চুল কাটা শেষ হলে পল্টু খুশিমনে লাফাতে লাফাতে বাজারে চলে গেল। গিয়ে প্রথমে একটি সেলুনে ঢুকল। সেলুনের বড়ো আয়নায় সে যেই না নিজের চেহারাটা একবার দেখল–তার মনটাই কেমন খারাপ হয়ে গেল। মাথার চুলের অবস্থা দেখে নিজের গালে দুটো চড় মারতে ইচ্ছে হলো তার। মাথার অবস্থা দেখে রীতিমতো কান্না পেল ওর। মনে মনে সে ভাবল–কেন যে সবুর ভাইকে চুলটা কাটতে দিয়েছিলাম। পরে সে ফেরার পথে সবুরের মায়ের কাছে গিয়ে ওর বিরুদ্ধে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক নালিশ করল। নালিশ শুনে মা সবুর মিয়ার ওপর খুব খেপলেন। পরে পল্টুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'যাও বাবা। তুমি এখন বাড়ি ফিরে যাও। আমি ওকে বকে দেব।'

মায়ের কাছে পল্টু এসে নালিশ করে গেছে শুনে সবুর মিয়া বলল, 'বিনা পয়সায় এর চেয়ে ভালো চুল কাটা যায় না মা। তাছাড়া সে আমাকে তার চুলগুলো কাটতে দিলো কেন? আমি তো যেচে তার চুল কাটতে যাইনি।'

'আমি তোর কোনো কথা শুনতে চাই না। এখনি তুই পল্টুদের বাড়ি যাবি। গিয়ে কীভাবে এর সমাধান করবি তুই জানিস।' বলল মা।

মন খারাপ করে সবুর মিয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। কিছুদূর আসতেই পল্টুর সাথে হঠাৎ তার দেখা হয়ে গেল। পল্টুকে সে বলল, 'বিনা পয়সায় তোর চুল কেটে মনে হচ্ছে আমি বিরাট অপরাধ করে ফেলেছি। তুই আমার বিরুদ্ধে মায়ের কাছে নালিশ করেছিস। তোর নালিশের কারণে এখন আমি বাড়িছাড়া। তুই

এখন আমাকে চুল কাটার মাইনা দে। নইলে আমি তোকে কিছুতে যেতে দেবো না।'

সবুর মিয়ার কথা শুনে পল্টু কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'সবুর ভাই। মাফ চাই। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমার ভুল হয়ে গেছে। এবারের মতো তুমি আমাকে মাফ করে দাও।'

'মাফ তো করা যাবে না বৎস।' বলল সবুর মিয়া।

'তাহলে তুমি কী করতে চাও?' জানতে চাইল পল্টু।

কিছু একটা ভেবে সবুর মিয়া হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'যা তোকে মাফই করে দিলাম। তো একটা কথা...।'

'কী কথা সবুর ভাই?' জানতে চাইল পল্টু।

'না মানে বলছিলাম কী–তোর চুলটা আসলেই ভালো কাটা হয়নি। দেখতে একেবারে গলাছিলা মুরগির মতো লাগছে।' বলল সবুর মিয়া।

সবুর মিয়ার কথা শুনে পল্টুর রীতিমতো কান্না পেয়ে গেল। ধরা গলায় সে বলল, 'বলো কী সবুর ভাই! এখন তাহলে কী হবে? আমি এখন কী করব? এমন মাথা নিয়ে আমি কী করে বাড়ি যাব বলতে পারো?'

'উপায় একটা আছে। তুই চাইলে কাজটা আমি বিনা পয়সাতেই করে দিতে পারি।' বলল সবুর মিয়া।

'কী কাজ সবুর ভাই?' জানতে চাইল পল্টু।

'দে তোর মাথাটা সুন্দর করে কামিয়ে দিই। কদিন পর দেখবি চমৎকার ঘন হয়ে চুল গজিয়েছে। তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে বলবে–মাথায় এমন ঘন চুলের রহস্য কী রে পল্টু?'

সবুর মিয়ার বুদ্ধিটা পল্টুর বেশ মনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মাথাটা ওর কাছে সঁপে দিলো। ❑

---

গবেষণা কর্মকর্তা, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট

# মমতাময়ী

## মো. মনিরুজ্জামান মনির

মা কথাটি মিষ্টি অতি
শুনতে ভালো লাগে,
শ্রদ্ধা ভক্তি করতে হবে
মাকে সবার আগে।

মায়ের যত ভালোবাসা
দিয়েছেন তোমায় ঢেলে,
সবখানেতে জয়ী হবে
মায়ের দোয়া পেলে।

মায়ের মতো আপনজনা
হয় না কেহ ভবে,
সকল সময় তাই তো মাকে
খুশি রাখতে হবে।

মায়ের মনটা মধুমাখা
মা মমতার পাখি,
সুখে-দুঃখে তাই তো মাকে
মা-মা বলে ডাকি।

গল্প

# আমার মা

## নুরুল ইসলাম বাবুল

ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘুম ভাঙল। দুবার আড়মোড়া দিয়ে আরও কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখলাম, মা জায়নামাজ বিছিয়ে বসে আছেন। নামাজ শেষ করে গুণগুণ করে কোরানশরীফ পড়ছে। এরমধ্যে আমাকেও ডেকেছে দু'একবার। বিছানা ছেড়ে উঠে ওযু করে নামাজ আদায় করতে তাগাদা দিয়েছে। আমি আধো আধো ঘুমের ঘোরে শুধু হু-হা করেছি। কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠা হয়নি। আবার এ বছরের শেষের দিকে আমার প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা। সে কথা স্মরণ করে দিয়ে মা পড়তে বসতে বলেছে। কিন্তু আজ ছুটির দিন হওয়ায় ওঠা হয়নি। এরপর উঠতে গিয়ে জানালার দিকে চোখ গেল। বাইরে শিমুলগাছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বসে আছে, ছুটোছুটি করছে, কিচিরমিচির শব্দে গান করছে। ছোটো দাদার বাঁশঝাড়ের ফোকর গলিয়ে উঁকি দিচ্ছে লাল টুকটুকে সূর্য। হঠাৎ আমাদের কবুতরের খোপ থেকে পাখা ঝাপটানোর শব্দ হলো। শব্দ হলো বেশ জোরেই। ভয়ে চমকে উঠলাম। এমন করে পাখা ঝাপটাচ্ছে কেন পায়রাগুলো। ভয়ে ভয়ে মাকে ডাকলাম। কিন্তু আগেই ইবাদত শেষ করে বাইরে বেরিয়ে গেছে মা। আমি এবার তড়িঘড়ি করে উঠে পড়লাম। কোনো বিপদ না হলে ওরা এমন করবে কেন? এই ভেবে দৌড়ে দেখতে গেলাম আদরের কবুতরগুলো। বাড়ির

উঠোনের উত্তর পাশে কবুতরের খোপ। তখনও খুলে দেওয়া হয়নি খোপের দরজা। কিন্তু পাশের বাড়ির কালো বিড়ালটা এসে পা ঢুকিয়ে দিয়েছে খোপের ভেতর। ফলে ভয়ে পাখা ঝাপটিয়ে নিজেদের বিপদ সংকেত ঘোষণা করছে ওরা। আমি খোপের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই আমার মা উঠোন ঝাড়ু দেওয়া ঝাঁটা দিয়ে বিদায় করেছে বিড়ালটাকে। আমি আস্তে আস্তে খোপের দরজা খুলে দিলাম। মা ওদের খাওয়ার জন্য গমের দানা এনে দিলো। আমি একটু একটু করে ছিটিয়ে দিলাম। কবুতরগুলো খেয়ে চলে গেল। ততক্ষণে মা উঠোন ঝাড়ু দেওয়া শেষ করেছে। শেষ করে উঠোনের দক্ষিণ পাশে রাখা ধান ভিজানো বিশালাকার চাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কখনো উবু হয়ে কী যেন করছে। প্রথমে ভাবলাম আজ হয়ত ধান সিদ্ধ করবে মা। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম চাড়িতে ধান নেই। গতরাতের বৃষ্টিতে পানি জমে আছে। মা হাতের ঝাড়ুটি দিয়ে পানির ভেতর থেকে কী যেন উঠানোর চেষ্টা করছে।

কাছে গিয়ে দেখি কয়েকটা কুনোব্যাঙ আর দুটো ইঁদুরছানা সাঁতরাচ্ছে। বারবার উঠে আসার চেষ্টা করছে। মা ওদের তুলে আনার জন্য ঝাড়ু এগিয়ে দিচ্ছে।

আমি কৌতূহল নিয়ে বললাম, কী করছ, মা।

মা বলল, এগুলো বিপদে পড়েছে। বিপদ থেকে উদ্ধার করছি।

বলতে বলতেই ইঁদুরছানা ও ব্যাঙগুলো তুলে ছেড়ে দিলো মা।

আমি বললাম, মা, কুনোব্যাঙগুলো ছেড়ে দিয়েছ, ভালো করেছ। কিন্তু ইঁদুরছানাদের বাঁচিয়ে দিলে কেন? ওরা তো আমাদের বইখাতা কেটে ফেলে। ফসল নষ্ট করে। আরও অনেক ক্ষতি করে।

মা বলল, সেটা করে। কিন্তু আজ ওরা অথৈ সাগরে পড়েছিল। ওদের এমন বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম।

আমি মায়ের কথা ভালো করে বুঝতে পারলাম না। না বুঝে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসলাম।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ল। মা রান্না শেষ করে খেতে ডাকল। বাবা ও ছোটো ভাইয়ের সাথে খেয়ে উঠলাম। তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়ালাম। মা খেতে বসার আগে একমুঠো ভাত রান্নাঘরের চালে ছিটিয়ে দিলো। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, মা এতগুলো ভাত চালের উপর ছিটিয়ে দিলে কেন?

মা হাসিমুখে বলল, ওখানে আমার মেহমান আসবে। ওদের জন্য দিয়ে রাখলাম। আমি মায়ের কথা ভালো করে বুঝতে পারলাম না। তবে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখলাম কয়েকটা শালিকপাখি এসে ভাতগুলো খুঁটে খুঁটে খেয়ে গেল। একটু পরে এল দুটি কাক। ওরাও খেলো। মায়ের খাওয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে আরও কয়েকটি পাখি এল। আমি ওদের নাম জানি না। মা আরও কিছু ভাত ছিটিয়ে দিলো।

একটু একটু করে বেলা বেড়ে দুপুর হতে লাগল। আকাশে গনগনে রোদের তেজ বেড়েই চলছে। আমার মা নানা কাজে ব্যস্ত। ঘর পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া, থালাবাসন মাজা, খড়ি জোগাড় করা আরও কত কী! এর মধ্যেই দেখলাম একটা ভাঙা হাঁড়িতে করে পানি নিয়ে ঘরের পেছনে রাখল। এবার মাকে কিছু বললাম না। নিজে নিজে পানি ভর্তি ওই ভাঙা হাঁড়ির দিকে খেয়াল রাখলাম। বেশকিছু সময় কেটে গেল। কিন্তু ভাঙা হাঁড়িতে পানি রাখার রহস্য উন্মোচন হলো না। হঠাৎ দেখি সাঁই সাঁই করে দৌড়ে আসছে একটা কুকুর। ওর জিভটা বেরিয়ে এসেছে অনেকখানি। মনে হলো ভীষণ পিপাসা পেয়েছে কুকুরটির। এসেই চুক চুক শব্দ করে খেয়ে ফেলল ভাঙা হাঁড়ির সবটুকু পানি। তারপর খুব শান্ত হয়ে গাছের ছায়ায় শুয়ে রইল কুকুরটি। এ দৃশ্য দেখে আমার দু'চোখে জল এসে গেল।

ঘরের ওপাশ দিয়েই রাস্তা। মাটির হাঁড়ি-পাতিল বিক্রি করা ফেরিওয়ালা হাঁক দিতে দিতে যাচ্ছিল। মা ডাকলেন তাকে। একটি পাতিল ও কলস কিনলেন। বুড়ো ফেরিওয়ালা মূল্য বুঝে নিয়ে উঠে যাচ্ছিল। মা ডেকে বলল, বাবা, একটু বসো। এই দুপুরবেলা একটু পানি খেয়ে যাও।

আমি দেখলাম আমার মা কুমারপাড়ার বুড়ো ফেরিওয়ালাকে পেট ভরে ভাত খাইয়ে তবেই বিদায় দিলো।

বেলা গড়িয়ে গেল। আমরা গোসল করে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। কিন্তু মা গোসল করার সময় পাচ্ছে না। এটা-সেটা নানান কাজে ভীষণ ব্যস্ত সে। কাজ শেষে যখন গোসল করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিক তখনই পাশের বাড়ির এক চাচি এসে বলল, বুঁজি, একমুঠো ভাত দিবে। ছোটো ছেলেটি খুবই কান্নাকাটি করছে।

মা হাসিমুখে একথালা ভাত দিয়ে দিল। সাথে গতরাতের ঝড়ে পড়া কিছু আম দিয়ে বলল, কেটেকুটে খাস।

পাশের বাড়ির চাচি হাত বাড়িয়ে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

এবার আমি দৌড়ে মায়ের কাছে গেলাম। শাড়ির আঁচল ধরে শরীরের সাথে লেপ্টে গেলাম। মা বলল, তোর আবার কী হলো।

আমি বললাম, মা, তুমি এত কিছু কেন করো।

মা যেন আমার কথা বুঝতেই পারল না। ঠিক সেরকম করেই বলল, কই, আমি আবার কী করলাম?

আমি সকাল থেকে এ পর্যন্ত দেখা সবকিছু বললাম। মা আমার কথা শুনে হেসে কুটিকুটি হয়ে বলল, এত সব খেয়াল করেছিস তুই?

আমি নাছোড়বান্দা হয়ে জানতে চাইলাম, বলো মা, এত কিছু কেন করো তুমি?

মা বলল, কেন স্কুলের বইতে পড়িসনি- 'জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

আমি মায়ের মুখের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমার মা আবারও বলল, বড়ো হও বাবা, সব বুঝতে পারবে। তারপরও আমি আমার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মা মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, যাও বাবা, আমি গোসল করব। আমি সরে গিয়ে বারান্দায় শুয়ে রইলাম। আজ সারাদিনে করা মায়ের কাজগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলাম। আর মনে মনে আবৃত্তি করলাম, 'জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' ❑

---

শিশুসাহিত্যিক, কবি ও শিক্ষক

# এক ইতিহাসের নাম

## মাহমুদুল হাসান খোকন

পহেলা মে ঐতিহাসিক মে দিবস বা বিশ্ব শ্রমিক দিবস। এ দিবসটি বিশ্বের সব শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। যা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবেও পরিচিত। প্রতি বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিবসটি পালন করা হয়। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মে দিবস জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালন করে আসছে। রক্তাক্ত এক ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে পরিচিত মে দিবস তথা শ্রমিক দিবস। শ্রমিকরা এ দিনটির জন্য নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে অধিকার আদায়ে মরিয়া হয়ে উঠে। দিনের বেশিরভাগ সময় কঠোর পরিশ্রম আর কম পারিশ্রমিক পাওয়া শত শত শ্রমিক মালিকপক্ষের উপর গর্জে উঠে একটি সুনির্দিষ্ট সময় নির্ণয়ের জন্য। সে সময় সেই নির্যাতিত শ্রমিকদের একান্ত দাবি ছিল যে, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করবে, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম করবে আর ৮ ঘণ্টা নিজের জন্য রাখবে। কিন্তু তাদের প্রতিদিন ১০-১২ ঘণ্টা বা তার চেয়েও অনেক বেশি সময় কাজ করতে হতো কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। সময়ের কালক্রমে বিশ্বের নানা প্রান্তে শ্রমিকরা বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলে। সংগঠনগুলো দৈনিক একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি কাজ করার সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যার ফলে দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে কাজকে আদর্শ কর্মঘণ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জোর দাবি করে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিক আন্দোলনই মহান মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস নামে পরিচিত। শ্রমজীবী সব মানুষের মনে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা জোগায় এই দিনটি।

আমেরিকার শিকাগো শহর তখন শিল্পায়নের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বিশ্বের অনেক দেশ থেকে বিভিন্ন কাজের সন্ধানে শিকাগো শহরে শ্রমিকরা কাজের খোঁজে আসতে থাকেন। দৈনিক গড়ে মাথাপিছু দেড় ডলারের বিনিময়ে তাদের দিন-রাত শ্রম দিতে হয়েছে।

তাদের কাজের সময় ছিল সপ্তাহে ৬ দিনই। অনেকটা যন্ত্রমানবের মতো। কাজ করতে করতে যেন কাজ করার যন্ত্র হয়ে উঠেছিল এই শ্রমিকরা। হাজার কষ্ট সহ্য করেও তারা কখনো মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পর্যন্ত পেত না। কারণ শ্রমিকরা তখনও

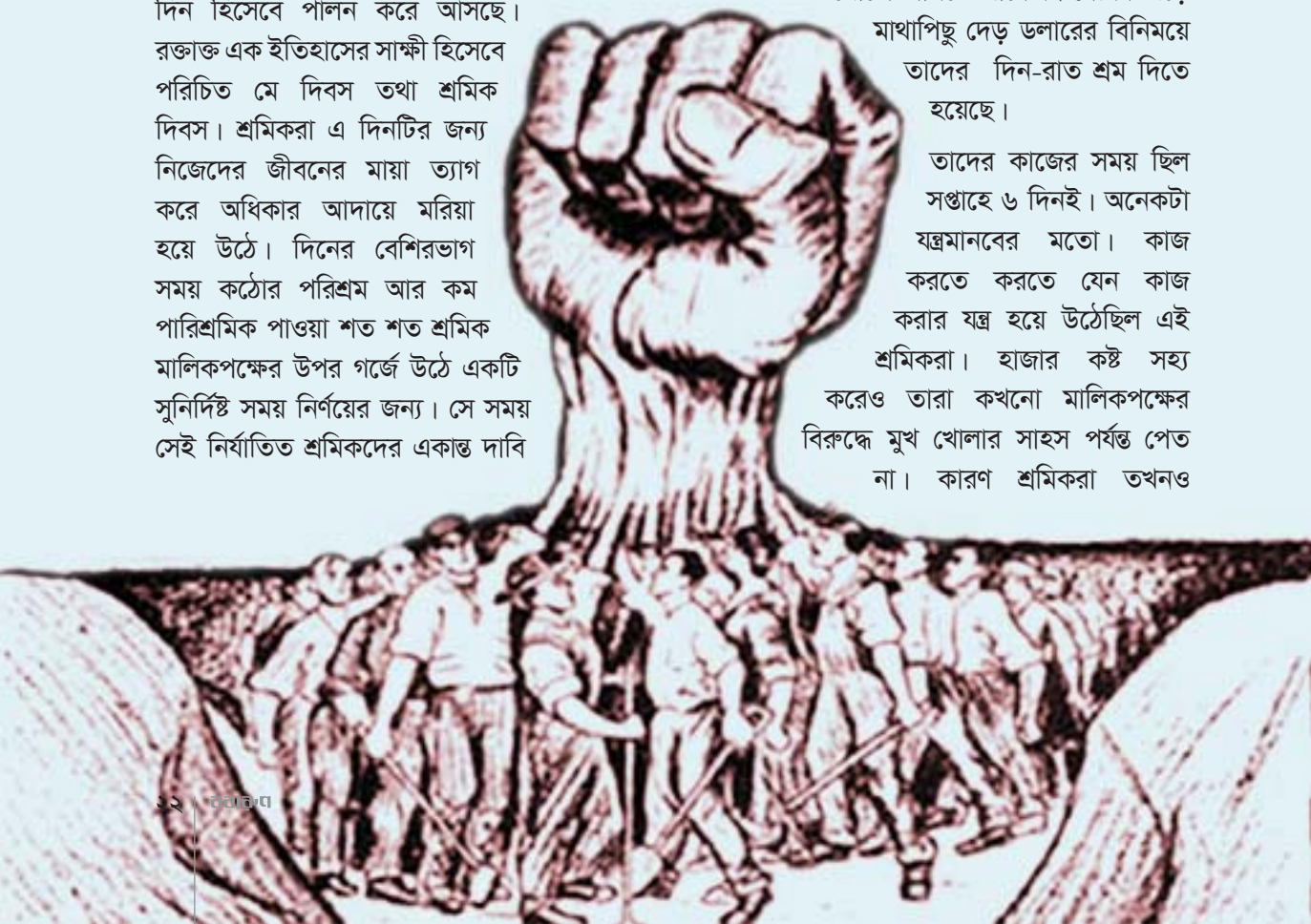

সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর মনোবল ও শক্তি সঞ্চয় করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

অনেকেই দৈনিক গড়ে ৮ ঘণ্টা করে কাজের সময় নির্ধারণ তথা প্রতিষ্ঠার দাবি জানানোর ফলে মালিকের হাতে কঠোর হস্তে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হতে হয়েছে। ফলে বাকি শ্রমিকদের মনের ভিতর নানান ভয় সঞ্চার করা হয়েছে। তবু পরবর্তীতে আমেরিকার শিকাগো ও নিউইয়র্ক শহরসহ বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে ওঠে সংঘবদ্ধ জোর আন্দোলন। ১৮৮৪ সালের অক্টোবরে আমেরিকার 'ফেডারেশন অব অর্গানাইজড ট্রেডস এন্ড লেবার ইউনিয়নস' এর এক জরুরি বৈঠকে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের সময় প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা শুরু হয়। এরপর আমেরিকার বিভিন্ন লেবার ইউনিয়নের সম্মতিক্রমে ১৮৮৬ সালের মে মাসের ১ তারিখে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। দাবি ছিল একটাই, দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ আর নয়।

শ্রমিকদের এই ধর্মঘটের বিপক্ষে মালিকপক্ষ সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনকে কঠোরহস্তে মোকাবিলা করার জন্য শ্রমিক ইউনিয়নের সকল নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। তবু মালিকপক্ষের এই ১৪/১৬ঘণ্টা কাজের কঠিন বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে শ্রমিকরা। যা ১৮৮৬ সালের মে মাসের ১ থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত এই আন্দোলন চলমান ছিল।

এরপর শিকাগো শহরে বিক্ষোভরত খেঁটে খাওয়া শ্রমিকদের উপর চড়াও হয় মালিকপক্ষের পুলিশ। এর এক পর্যায়ে শিকাগোর ম্যাককরমিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির সামনে পুলিশ গুলি চালায় আন্দোলনরত নিরীহ শ্রমিকদের উপর। এতে কয়েক শ' শ্রমিক আহত হয় আর নিহত হয় দুইজন। এই হতাহতের কারণে শ্রমিকরা আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পরের দিন হাজার হাজার শ্রমিক তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে শিকাগোর 'হে মার্কেট স্কয়ারে' সমবেত হন।

এর আগের দিন পুলিশকে লক্ষ্য করে কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি বোমা ছুঁড়েছিলেন। ফলে পুলিশ এবং আন্দোলনকারী শ্রমিকদের মধ্যে শুরু হয় উত্তপ্ত বাক্য

বিনিময় এবং তুমুল  সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের ফলে সাতজন পুলিশ এবং চারজন শ্রমিক নিহত হয়। নিজেদের দাবি আদায় করতে আসা শত শত নিরস্ত্র অনেক শ্রমিক হতাহত হয়। পৃথিবীর শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে এটি লেখা হয়ে থাকে 'হে মার্কেট ম্যাসাকার' নামে। তবে পুলিশের উপর সেদিন কে বা কারা বোমা নিক্ষেপ করেছিল তা আজও অমিমাংসিত অবস্থায় রয়েছে।

এই ভয়াবহ ঘটনার পর মার্কিন সরকার শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। নৈরাজ্যবাদী হিসেবে আট জন শীর্ষস্থানীয় শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গ্রেফতারের খবরটি বেশ সাড়া ফেলে। অপরদিকে তখন আইন ও মানবিক বিচারব্যবস্থা শ্রমিকদের মূল দাবি '৮ ঘণ্টা কর্মঘণ্টা'র দাবিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। অন্যদিকে ১৮৮৯ সালের মে মাসের ১ তারিখকে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' বলে ঘোষণা দেয় 'ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর ওয়ার্কার্স এন্ড সোসালিস্টস'। হে-মার্কেট ম্যাসাকারকে শ্রমিক আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

যদিও আমেরিকার সরকার এই ঘটনার কোনো স্বীকৃতি দেয়নি এবং শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কাজের দাবিকে কোনো প্রকার গুরুত্ব দেয়নি। অনেক দেরিতে হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৬ সালে আমেরিকা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিকে আইনি স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে দ্বিতীয় নিকোলাসের পতনের ঠিক ৪ দিন পর আমেরিকা সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে 'দিনে ৮ কর্মঘণ্টা'র স্বীকৃতি দেয়।

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের চরম আত্মত্যাগের ন্যায্য অধিকার আদায়ের এক অবিস্মরণীয় দিন। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের শ্রম দিয়ে যাবেন। তবে মালিকরাও শ্রমিকদের সুবিধা অসুবিধার বষয়গুলো সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে এটাই সবার প্রত্যাশা। ❑

---

শিশুসাহিত্যিক

# শিশুশ্রম নয়

## গোলাম নবী পান্না

শ্রম নিয়ে যত কথা
'মে দিবস' এলে
খেটে খাওয়া মানুষের
মুখগুলো মেলে।

বড়োদের পাশাপাশি
ছোটোরাও দেখি
শ্রম দেয় কম এই
বয়সেও একই!

লেখা দিয়ে তাই চাই
শিশুশ্রম নয়
শিক্ষার মাঝে তার
হোক পরিচয়।

# মে দিবসের ছুটিতে

## সুজন বড়ুয়া

জামালউদ্দিন স্যার ক্লাসে ঢুকেই প্রশ্ন করেন, আজ কয় তারিখ? স্যারের ক্লাসটা খুব মজার। চমক দিয়েই ক্লাস শুরু করেন স্যার। কখনো ক্লাসে ঢুকেই শুরু করে দেন গল্প। চুম্বকের মতো এমন টেনে রাখেন যে, চোখ ফেরাবার জো থাকে না। গল্পে গল্পেই শেষ হয়ে যায় তার পাঠদান। রোকনদের মনেই হয় না ক্লাস করেছে। কোনো শাসন ত্রাসন নেই, কেবল হাসি-আনন্দ, মজা আর মজা। কত অজানা কথা যে জানা যায়! অন্য কোনো স্যারের ক্লাসে এতটা মজা হয় না। তাই জামালউদ্দিন স্যার রোকনের খুব প্রিয়।

আজও জামাল স্যার ক্লাসে ঢুকেই জানতে চাইলেন কয় তারিখ?

রোকনদের ফার্স্টবয় হাসান দাঁড়িয়ে বলল, স্যার, আজ ৩০শে এপ্রিল।

স্যার আবার জানতে চান, আগামীকাল কয় তারিখ?

হাসান বলল, ১লা মে।

১লা মে- কে কোন দিবস বলা হয়? – স্যার কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকান।

সেকেন্ডবয় শৈবাল বলল, মে দিবস।

স্যার এবার প্রশ্ন করেন, ১লা মে কে কেন মে দিবস বলা হয়? মানে দিনটি কী জন্য বিখ্যাত? এ দিনে কী হয়েছিল?

পুরো ক্লাসে নীরবতা। অনেকক্ষণ পর থার্ডবয় মোহন জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ায়, স্যার শ্রমিক দিবস বলা হয়।

স্যারের মুখটা এবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আচ্ছা, এ দিন কী ঘটেছিল সেটা কে বলতে পারবে? – বলেই

স্যার ক্লাসের ছাত্রদের ওপর চোখ বুলাতে থাকেন হালকাভাবে।

ঢাকার কমলাপুর বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস এইটে পড়ে রোকন। পরীক্ষায় তার কোনো প্লেস থাকে না। কিন্তু সে খুব মনোযোগী ছাত্র। নিয়মিত স্কুলে আসে। জামাল স্যারের ক্লাস কখনো কামাই করে না সে। স্যারও চেনেন তাকে। স্যার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে একে একে সবার মুখের দিকে তাকান। আজ রোকনের মুখের দিকেও তাকান একবার। কিন্তু উত্তর দেওয়ার জন্য দাঁড়ায় না কেউ। স্যারই বলতে শুরু করেন এবার–

'তাহলে ইতিহাসের সেই গল্পটি শোনো তোমরা, ১লা মে-কে বলা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। ১৮৬৬ সালের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বাল্টিমোর শহরে ৬০টি শ্রমিক সংগঠন আন্দোলনের ডাক দেয়। তাদের দাবি শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু মালিকপক্ষ শ্রমিকদের এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। শ্রমিকরা তাদের দাবিতে অনড় থাকেন। তারা আন্দোলন চালিয়ে যান। কিন্তু মালিকপক্ষ তাদের দাবি বার বার ফিরিয়ে দিতে থাকেন। এক বছর দু'বছর করে এভাবে বিশ বছর গড়িয়ে যায়। ১৮৮৬ সালের মে মাস। শ্রমিকরা এ মাসের ৩ ও ৪ তারিখ ধর্মঘটের ডাক দিয়ে নেমে আসেন রাজপথে। অন্যদিকে মালিকপক্ষ দমনপীড়নের পথ বেছে নেন। তারা পুলিশের সাহায্যে শ্রমিকদের রুখে দিতে প্রস্তুত। ৩রা মে তারিখে 'ম্যাক-কমিক রিপার' নামে কারখানার শ্রমিকদের এক সভায় পুলিশ আক্রমণ চালায়। এতে ৬ জন শ্রমিক প্রাণ হারান এবং অনেকে আহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ৪ঠা মে শিকাগোর হে মার্কেট চত্বরে বসে শ্রমিকদের সভা। শান্তিপূর্ণ এই সভায় পুলিশ পুনরায় হামলা করে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। এতে উভয় পক্ষের প্রাণহানী হয়। আন্দোলনরত বহু শ্রমিকনেতাকে কারারুদ্ধ করে পুলিশ। এভাবে প্রায় নিয়মিত শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৮৮৯ সালে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' নামে ফ্রান্সের প্যারিস শহরের একটি সংগঠন শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে আসে। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' শ্রমিকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানায় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে স্ব স্ব দেশের শ্রমিকদের আইন করে আট ঘণ্টা কাজের সময় বেধে দেওয়ার দাবি উত্থাপনের প্রস্তাব পেশ করে। ফলে ১৮৯০ সাল থেকে এই দাবির ভিত্তিতে আমেরিকাসহ ইউরোপের দেশে দেশে 'মে দিবস' উদযাপন শুরু হয় এবং শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে ১লা মে সব দেশে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হতে থাকে।'

ক্লাস জুড়ে পিন পতন নীরবতা। গভীর মনোযোগে জামাল স্যারের দীর্ঘ ইতিহাস শুনছিল সবাই। স্যারের আলোচনা শেষে রোকন উঠে দাঁড়ায়, স্যার, মে দিবস চালু হওয়ার আগে শ্রমিকদের দৈনিক কত ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো?

স্যার বললেন, নিশ্চয়ই আরো বেশি, অন্তত দশ-বারো ঘণ্টার কম না। এটা অমানবিক ছিল বলেই তো ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস নির্ধারণের দাবি ওঠে।

রোকন চুপচাপ বেঞ্চে বসে পড়ে এবার। কিন্তু একটি ভাবনা সঙ্গে সঙ্গে নাড়া দিয়ে যায় তাকে। অথচ আমার মাকেতো ঘরে- বাইরে মিলিয়ে কাজ করতে হয় পনেরো ঘণ্টারও বেশি। রোকন মনে মনে ধন্যবাদ জানায় জামাল স্যারকে। স্যার যদি ক্লাসে এই বিষয়টি না বলতেন হয়ত এত তাড়াতাড়ি এসব কথা জানা হতো না। অজানা বিষয়ে দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন স্যার। রোকন ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে ওঠে কেমন।

রোকনরা ময়মনসিংহের মানুষ। গ্রামে বড়ো অভাব অনটনে দিন কাটত তাদের। বাবা-মায়ের নাকি মাঝে মাঝে কাজই জুটত না। তাই রোকন আর ছোটো বোন সায়রাকে নিয়ে একদিন বাবা-মা। তারা শুনেছিলেন ঢাকা শহরে কাজের অভাব হয় না। আয়-রোজগারের একটা না একটা উপায় হয়ে যায়। এই আশায় গ্রাম থেকে বাবা-মা চলে এসেছিলেন ঢাকায়। কমলাপুর রেল স্টেশনে নেমে রেললাইনের ধারের বস্তি এলাকায় বাবার চেনা কলিমউল্লাহ চাচার পাশেই ঠাঁই নিয়েছিলেন তারা। চট-চাটাই দিয়ে বানিয়ে নিয়েছিলেন একটি ছাপড়া ঘর। এখনো সেখানেই

আছে রোকনরা। কিন্তু নেই শুধু একজন মানুষ– বাবা। ঢাকায় এসে বাঁচার জন্য বাবা শুরু করেছিলেন রিকশা চালানো। মা দুই বাসায় খুঁজে নিয়েছিলেন কাজ। ছেলে-মেয়েকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন কাছের কমলাপুর স্কুলে। কষ্টে-সৃষ্টে দিন ভালোই চলছিল মোটামুটি।

কিন্তু একদিন ঘটল যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন বাবা। মা পড়লেন অথৈ সাগরে। উঠতি বয়সের দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে কী করবেন তিনি? তার স্বপ্ন ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবেন, একেবারে অকাট মুর্খ বানাবেন না। তাই ছেলে-মেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে নিলেন না তিনি। ছেলে রোকন এখন পড়ে ক্লাস এইটে আর মেয়ে সায়রা পড়ে থ্রিতে। এই বাড়তি খরচ মেটানোর জন্য মা কাজ ধরলেন ঘরে বাইরে। সকালে আর সন্ধ্যায় দুই বাসায় করেন কাজ। আর দিনের বেলায় শুরু করলেন রাস্তার ধারে কনট্রাক্টরের ইট ভাঙার কাজ। এতে মজুরি হিসেবে টাকাটা পাওয়া যায় নগদ আর পরিমাণেও একটু বেশি। তাই কষ্ট হলেও তা গায়ে মাখেন না মা।

কিন্তু রোকন জানে একসঙ্গে এত ভারী কাজ করতে মার ভীষণ কষ্ট হয়। রাতের বেলা ঘাড় ও কোমরের ব্যথার জ্বালায় মা ঘুমাতে পারেন না । এপাশ থেকে ওপাশ ফিরতেই মা ব্যথায় হাঁসফাঁস করে ওঠেন। হাতুড়ির হাতলের ঘা লেগে লেগে হাতের নরম তালুতেও কড়া পড়ে গেছে মার। এভাবে ঘরে-বাইরে খেটে খেটে না জানি মার শরীরে আরো কত রোগ বাসা বাঁধছে। ভেতরে ভেতরে চিন্তিত হয়ে ওঠে রোকন। এসব ভেবে ভেবে রাতের বেলা ঘুম এল না তার।

সকালবেলা উশখুশ করতে করতে বিছানা ছাড়ে রোকন। মাকে বলল, মা, আইজ মে দিবস, সরকারি ছুটির দিন, আমার স্কুল বন্ধ। আইজ তুমার ইট ভাঙার কামডা তোমার বদলে আমি করি দিমু। তোমার শরীল খারাপ, তুমি আইজকার দিনডা বাসায় থাইকা শুইয়া বইসা কাডাও ।

ছেলের কথা শুনে মা হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। মনে মনে ভাবেন, ছেলে এসব বলে কী, পাগল ছেলে! মা মমতা ভরা চোখে ছেলেকে দেখতে থাকেন। খানিক চুপ থেকে বলেন, না না, তুই পাইরবি না নি বাপ। তুই কইরলি হবি না।

রোকন এবার আপত্তি জানিয়ে বলল, আমি বেশ পাইরব মা। আমি অহন ঢের বড়ো হইছি। তুমি তোমার অন্য কামগুলা শেষ কইরা বাসায় আইসা আরাম কইর। আমিই আইজ ইট ভাইঙব।

মা কখন কোন রাস্তার ধারে ইট ভাঙার কাজ করেন সব রোকনের জানা। রাতের ভেজানো অল্প কটা পান্তাভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

সকাল ৮টা বাজে। অতীশ দীপঙ্কর সড়কের পাশে টিটি পাড়ার মোড়ে মার ইট ভাঙার কাজ। রাস্তা খুঁড়ে ড্রেনে নতুন পাইপ বসানোর জন্য ইট ভাঙতে হচ্ছে। এখানে পৌঁছে রোকন দেখে আশেপাশে সবাই কাজ শুরু করেছে। মার পাশের স্তূপে কাজে বসেছেন জমিলা খালা। খালাকে সালাম দিয়ে মায়ের জায়গায় কাজ করতে বসে রোকন। জমিলা খালা একবার তার দিকে তাকান, কী রে, তোর মা আইব না আইজকা।

না খালা, আইজ মার কাম আমিই করুম।

জমিলা খালা আর কোনো কথা বলেন না। চুপচাপ কাজ করতে থাকেন। ইট ভাঙার এই কাজটা কীভাবে করতে হয় রোকন জানে। মা ইট ভাঙার সময় খেয়াল করে দেখেছে কয়েকবার, কাজটা প্রায় শিখে নিয়েছে সে। ইটের ওপর কায়দা করে জোরে হাতুড়ি পেটাতে হয়। তেমন কঠিন কিছু নয়। রোকন ধীরে ধীরে নিজের কাজে মন দেয়।

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। রোকনও একমনে কাজ করছিল। হঠাৎ তার ভাঙা ইটের স্তূপের পাশে মাঝ বয়সি এক লোক এসে দাঁড়ান। রোকন তাকে চেনে। কনট্রাক্টর ম্যানেজার। রোকন দেখামাত্র তাকে সালাম দেয়–আস্সালামু আলাইকুম স্যার।

লোকটা গম্ভীর মুখে বলেন, তুমি কে? তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।

রোকন এবার নিজের পরিচয় দেয়, এখানে যিনি কাম কইরতেন রাহেলা খাতুন, আমি তার ছেলে। আইজ মার শরীল খুব খারাপ। তাই আমি তার বদল কাম কইরতে আইছি।

মার কাজ ছেলে করলে হবে না রে বাপু। এটা সরকারি কাজ। তুমি তো এখনো শিশু। এসব ভারী কাজে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। ম্যাজিস্ট্রেট এসে তোমাকে কাজ করতে দেখলে ফাইন করতে পারে। তুমি বাড়ি যাও খোকা, তোমার মাকে পাঠাও। কাজে আসতে না পারলে অ্যাবসেন্ট ধরা হবে কিন্তু। বুঝলে? বাড়ি যাও।

রোকন হতভম্ব। কাজ বন্ধ করে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কী করবে ভেবে পায় না সহসা। সবকিছু কেমন এলোমেলো মনে হয় তার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে হাঁটতে থাকে বাড়ির দিকে।

রোকনের বাড়ি আসতে আসতে দুপুর। ঘরে ঢুকে দেখে মা গভীর ঘুমে অচেতন। আহা, মা কতদিন দিনের বেলা এভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেননি। এই ঘুম ভাঙাবো? ঘুমের অতলে ডুবে যাওয়া ক্লান্ত-শ্রান্ত মাকে দেখে বড়ো মায়া হলো রোকনের। কিছুতেই সে ডাকতে পারে না মাকে। বিষাদ ছাওয়া মনে দাঁড়িয়ে থাকে বিছানার পাশে।

কিন্তু অজান্তেই এক সময় কথা বলে ওঠে রোকন। মা, আমি আর তুমারে কাম কইরতে দিমু না। আমি অহন ঢের বড়ো হইছি। আমি কাম কইরাম আর তুমি ঘরে বইসা বইসা খাইবা।

রোকনের কথা শুনে হঠাৎ ঘুম ভাঙে মায়ের। দেখেন অনেক রাত। রোকন শুয়ে আছে পাশের বিছানায়। মায়ের বুঝতে বাকি থাকে না, ছেলে ঘুমের ঘোরে কথা বলছে, হয়ত স্বপ্ন দেখছে। পাগল ছেলে।

মা তার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ান। রোকনের গা ধরে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকেন, রোকন, ওরে বাপ, ঘুমের মইধ্যে কী উলটাপালটা বকিস। তুই অহনো বড়ো হইসনি, তয় তোরে অনিক বড়ো হইতে হইব। হেই জন্যি অনিক লেহাপড়া শিখতি হইব বাপ। এহন ঘুমা বাপ, এহন ঘুমা। ❑

---

শিশুসাহিত্যিক

# শ্রমজীবী

## আবু রুশদা

শ্রমজীবী শ্রম দেয়
শ্রমিকের দাম দাও,
শ্রমিককে হেলা নয়
হাসিমুখে কাছে নাও।

শ্রমজীবী আছে বলে
নানা কাজে দেয় শ্রম,
শ্রমিকের অবদান
কারো প্রতি নয় কম।

শ্রমিকের ঘামঝরা
শ্রমে পাও সুখ,
এসো তবে দূর করি
শ্রমিকের দুখ।

# শ্রমিকের কথা

## রেজাউল করিম

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙে,
শ্রমিকেরা কাজে ঢুকে।
করেন পরিশ্রম সারাদিন,
তবু হাসি থাকে মুখে অমলিন।

বাচ্চারা পড়ে স্কুল-কলেজে,
যেন চাকরি পায় বড়ো হয়ে।
এই স্বপ্নে খাটেন তিনি,
রোদ-বৃষ্টি সয়ে।

তারাই গড়েন দেশটা মোদের,
তাদের সম্মানই বড়ো কথা।
মে দিবসে তাদের প্রতি,
রইল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

# শ্রমের দাম

## মাহফুজ বাবুল

ঘামে ভিজে তারা,
খাটনি করেন বেশ।
তারাই গড়েন সোনার বাংলা,
তাদের প্রতি ভালোবাসা অশেষ।

তারা যদি কাজ না করত,
এত ফসল কি হতো?
তাদের ঘামে ভেজে মাটি,
তাদের ঘামেই আসে খাঁটি।

মে দিবস তাই শেখায় যেন,
শ্রমিক মানে নয় তুচ্ছ কোনো।
সম্মান দিয়ে পাশে দাঁড়াই,
মে দিবসের মর্ম জানাই।

# মে দিবস

## ফারহান খান

মে দিবস এল গ্রীষ্মকালে,
আনে স্মৃতি সাহস সাথে।
শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমে,
চেয়েছিল অধিকার পেতে।

শিকাগোতে উঠেছিল ঝড়,
তা ছড়িয়ে যায় দেশ-দেশান্তর।
তাদের ত্যাগে পাই এ দিন,
তাদের ভুলব না কোনোদিন।

*[ দশম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা ]*

আত্মকাহিনি

# একটি হাতুড়ি

## খান সাকিব-উল হুসেন

যখন রতন কামার আমাকে বানালো তখনই মনে হয়েছিল, আমার মাথাটা বেশ মোটা হয়েছে। আর নাকটা লম্বাটে হয়েছে। একদম কলার মোচার মতো! তারপর বাজারে আমার দামও উঠে গেল। মানুষেরা আমাকে নিয়ে দরকষাকষির খেলায় মত্ত হলো। ব্যস, কেউ বলল নব্বই টাকা। কথা কেড়ে নিয়ে আরেকজন বলল, একশ টাকা। আরেকজন আবার বলল, একশ বিশ টাকা দেবো। আমাকে দিয়ে দেও রতন।

রতন কামার কথাটা আমলে নিল। দিয়ে দিল আমাকে লোকটার কাছে। ব্যস, আমিও সুযোগ বুঝে চেপে বসলাম লোকটার হাতে। যেতে যেতে পথে ভাবলাম, লোকটা মনে হয় আমাকে দিয়ে কম কাজ করাবে। হায় কপাল! রাত না যেতেই ঠুক ঠুক করে ইট ভাঙতে হচ্ছে।

কী চিনেছ তো আমাকে? না চেনার কী আছে বাপু। হ্যাঁ, আমি হাতুড়ি। মাথামোটা হাতুড়ি। লম্বাটে নাকের হাতুড়ি।

সে যাগগে, প্রথম দিনেই ঠুক ঠুক করে গুনে গুনে এক হাজার ইট ভাঙলাম। সারাদিন মাথাটা বেশ চলেছে আমার। তাও আমার তেমন কষ্ট হচ্ছিল না। কষ্ট হচ্ছিল বেচারা লোকটার ঘামের স্রোত দেখে। রোদ মাথায় নিয়ে তপ্ত দুপুরে লোকটা ইট ভাঙল। দরদর করে ঘাম ঝরছিল। ভীষণ মায়া লাগছিল। আমার জন্য মোটেও না, লোকটার জন্য।

সন্ধ্যায় বাড়ি এলাম। আমার বাড়ি না। আমার আবার বাড়ি! যখন যার তখন তার। লোকটার বাড়ি এলাম। লোকটা বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই ছোটো ছোটো দুটো বাচ্চা বেরিয়ে এল। চিৎকার করে উঠল। বলল ওরা, আব্বা এসেছে, আব্বা এসেছে। কী হাসিখুশি দেখাচ্ছিল ওদের। ময়লা জামা পরলেও ওদের হাসিতে একটা মায়া লক্ষ্য করলাম।

একটা বাচ্চা বলল, আব্বা, আব্বা জামা আনিছো? আরেকটা বাচ্চাও বলল, আব্বা, আব্বা পুতুল আনিছো?

লোকটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। উত্তর দিল, নারে মা। মালিক টাকা দেয় নাই, কাল আনব।

বাচ্চা দুটোর মুখগুলোও ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ইশ, কী খারাপটাই না লাগল আমার। ওদিকে রাতে লোকটার বউ বলল, ঘরে তো কোনো বাজার-সদাই নাই। আনতে হবে না?

লোকটা বলল, কাল হবে।

আজকেও ইট ভাঙছি। মোটা মাথাটা দিয়ে। ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক করে। হঠাৎ একটা লোক এল। ওরাও ইট ভাঙতে এসেছে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আজকে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। সবাই লাইনে দাঁড়িয়েছে। আমাকে হাতে নিয়ে লোকটা লাইনে দাঁড়াল। একপর্যায়ে টাকা দিতে এসে লোকটা বলল, বেশি বেশি ভাঙতে হবে তো। এই নেও তোমার দেড়শ টাকা। বাকি টাকা কাল নিও। লোকটা অনেক কাকুতিমিনতি করল আরও কিছু টাকা দেওয়ার জন্য কিন্তু কে শোনে কার কথা। আমার মাথা ভীষণ বিগড়ে যাচ্ছিল। আমার যদি দুটো পা থাকত, লোকটার মাথায় ঠুকে দিতাম। হায় কপাল! তা আর পারলাম কই।

লোকটার মন ভীষণ খারাপ। রোদে পুড়ে কয়লার মতো কালো হয়ে গিয়েছে লোকটা। শরীরেও বল পাচ্ছে না। আমার তখন মনে পড়ছে লোকটার বউয়ের কথা। বাজার হবে আজকে, কত আশা নিয়ে বসে আছে। বাচ্চা দুটোর কথা। ওরা কত্ত আশা করে বসে আছে আব্বা জামা, পুতুল নিয়ে আসবে... ❑

শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

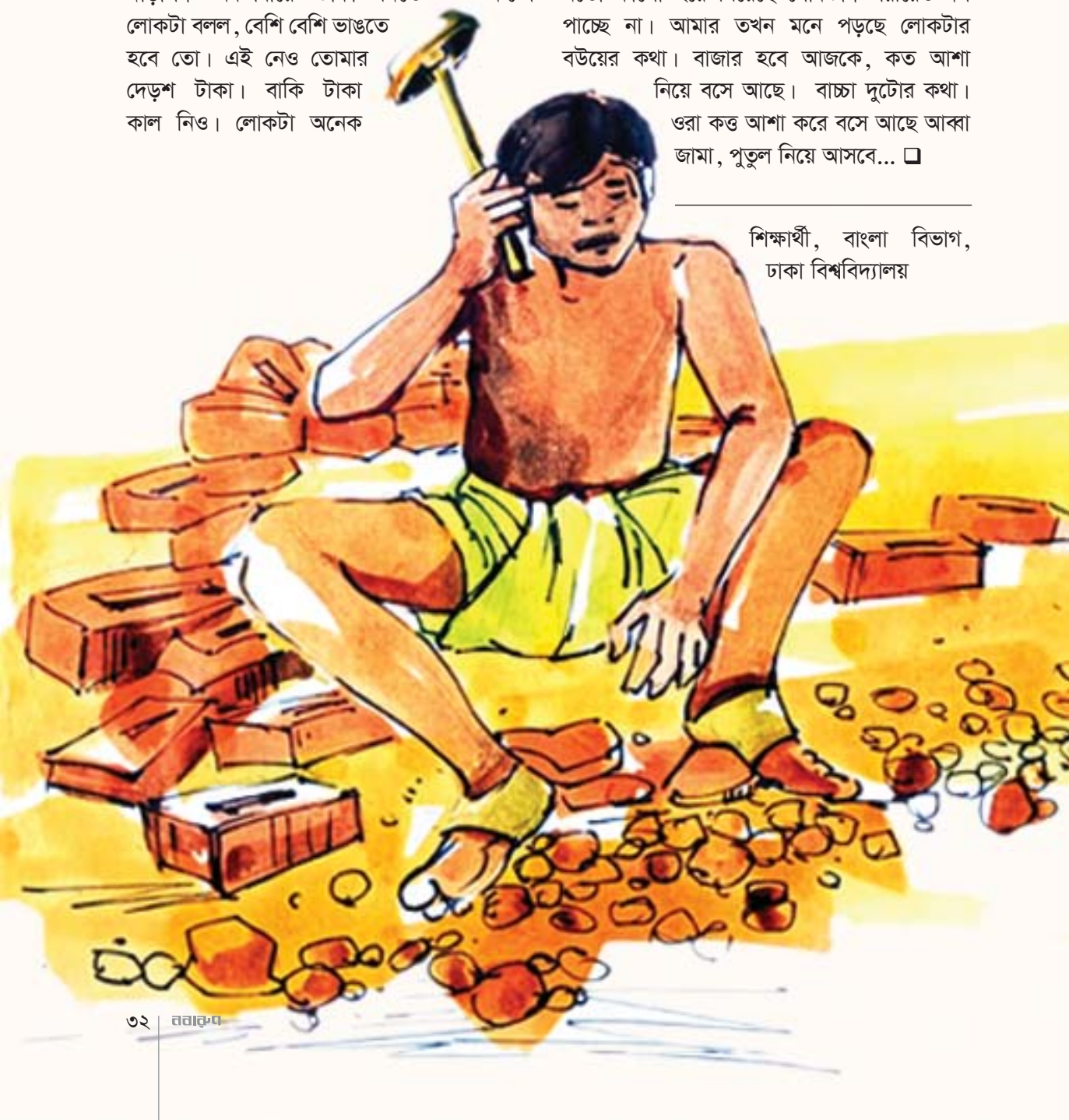

# রবির কিরণে জেগে ওঠা

## জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

রবীন্দ্রনাথ এমন একটি নাম যা উচ্চারণ করলেই বাঙালির হৃদয়ে ধ্বনিত হয় এক স্পন্দন। আর এজন্য ২৫শে বৈশাখ বাঙালির ইতিহাসে এক আশ্চর্য জন্মক্ষণ, যখন বাংলার আকাশে উদিত হয় এক নতুন সূর্য। তিনি শুধু কবি নন, তিনি এক বিশ্বপুরুষ। শুধু সাহিত্যিক নন, এক ধ্রুপদ আন্দোলন। শুধু গীতিকার নন, বরং এক সুরমগ্ন আত্মা। তাঁর জন্ম যেন অবিভক্ত বাংলার ভাষার এক জাগরণ। তাই ২৫শে বৈশাখ আমাদের ক্যালেন্ডারে কেবল একটি তারিখ নয়, এটি একটি ধ্রুপদী জাগরণের দিন। বাংলা সাহিত্যের অন্তরতম বাতিঘর। তাঁর জন্ম কেবল একজন কবির নয়, একজন বড়ো মানুষ, এক সময়চেতনার এবং এক মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে ওঠা রূপান্তরের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় আমাদেরকে ভাবনার ভাষা দিয়েছেন। ছড়া, কবিতা, গল্প, নাটক, গান, উপন্যাস সব ক্ষেত্রেই তিনি আমাদের প্রেম, বেদনা ও আনন্দের শব্দরূপ। তিনি বিনি সুতার মালা গেঁথে দিয়েছেন আনন্দে, ছন্দে ও গানে। তাঁর কলম আমাদের আত্মার দালান নির্মাণ করেছে। যেখানে প্রকৃতি, মানুষ, স্রষ্টা ও নিজস্ব অন্তর্লোক একাকার হয়ে ওঠে।

তাই বলা যায়, এই জন্মদিন শুধু স্মরণ নয়, এক দীঘল অনুশীলন। তাঁর দর্শনের, তাঁর

ভালোবাসার, তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদের। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে করিয়ে দেন, শিল্পের চেয়ে বড়ো শিক্ষা হলো হৃদয়ের বিস্তার। শিক্ষা, প্রেম ও সৃষ্টি—এই ত্রিধারায় গড়ে ওঠা রবীন্দ্র-তরঙ্গে আজও ভেসে বেড়ায় আমাদের বাংলা। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে তাই আমরা তাঁকে কেবল স্মরণ করি না; আমরা তাঁর পথেই হাঁটি। তাঁর গান গাই, তাঁর কবিতা পাঠ করি, তাঁর ভাষায় জীবনকে নতুন করে চিনে নিতে চাই। কারণ, তিনি আমাদের সময়ের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া পরীক্ষিত মানুষ।

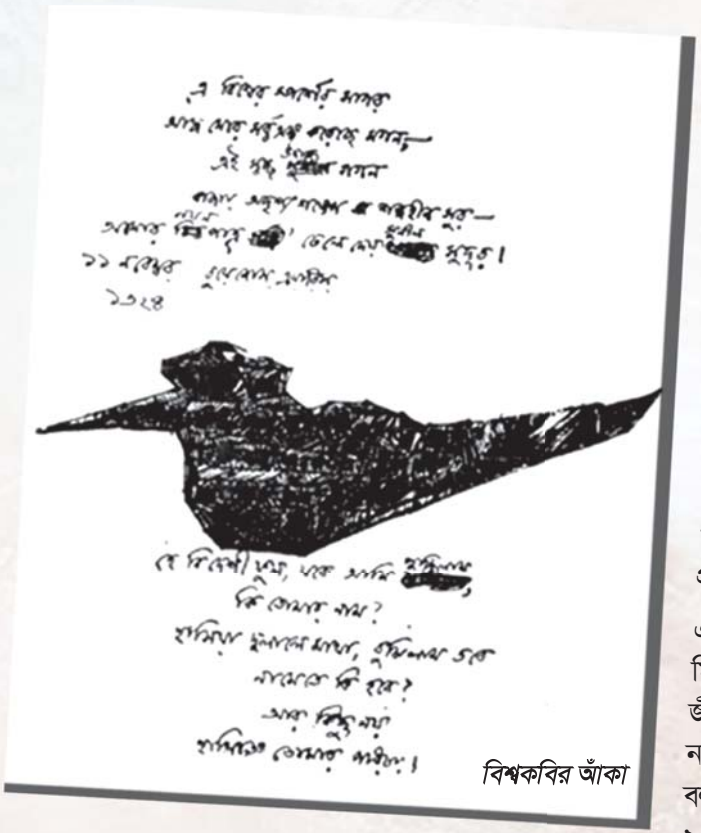

*বিশ্বকবির আঁকা*

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ছিল হৃদয়বান, মুক্তচিন্তাশীল এবং মনুষত্বনির্ভর। তিনি শিক্ষাকে কেবল পুথিগত জ্ঞান হিসেবে দেখেননি; বরং জ্ঞানচর্চার সাথে প্রকৃতি, সৃজনশীলতা ও মানবিক বিকাশের সংযোগ ঘটিয়েছেন। শান্তিনিকেতন ছিল তাঁর দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ খোলা আকাশ। বৃক্ষের ছায়ায়, গানে, নাটকে, আলোচনায় গড়ে উঠত শিশুমনের নির্মল আত্মবিকাশ। তিনি বলতেন, 'Education is not the amount of information that is put into your brain... it is a process of illumination.'

এই শিক্ষা চিন্তা আজও নতুন করে আমাদেরকে ভাবায়। একটি পাঠ্যপুস্তক নির্ভর, গতানুগতিক পরীক্ষা-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গদির বাইরে ভাবতে শেখায়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক অসাধারণ সুরকার। তাঁর সংগীত বিশ্বমানের। রবীন্দ্রসংগীত শুধু একটি ঘরানার নাম নয়, এটি বাংলার আত্মার সংগীত। যেখানে প্রকৃতি, দেশপ্রেম, ঋতুচক্র সব একাকার হয়ে মিশে গেছে। 'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম' -এই এক পঙক্তি বহন করে চিরকালীন বিচ্ছেদের গভীরতা; 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' এটি বিশ্বভুবনের একান্ত আপন প্রেমপত্র। তাঁর গানে বাংলা পায় নিজের ভাষা, পায় চোখের জল, পায় প্রাণের ভাষ্য।

এই তিনটি স্তম্ভ- শিক্ষা, সংগীত ও প্রেম মিলেমিশে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন বাংলার জীবন্ত আত্মা। তাঁর জন্ম কেবল এক কবির নয়, এক মানবতাবাদী চেতনার জন্ম। যিনি বলতেন, 'আমি মানবের গান গাই।' তাই ২৫শে বৈশাখ কেবল একটি উৎসব নয়, এটি একটি প্রতিশ্রুতি। এই ঘোরলাগা সময়েও, মানুষ হয়ে ওঠার যাত্রাপথে তাঁর আলো আমাদের পথ দেখাক। রবির কিরণে আবার জেগে উঠুক আমাদের মনুষ্যত্ব, সৃজনশীলতা ও মানবপ্রেম। ❑

---

সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ

## তুমি রবি বিশ্বকবি

### আসাদুজ্জামান খান মুকুল

রবি তোমার সকল সৃষ্টি
ছন্দে সুরে ভাসে,
আলোক ছুঁয়ে চোখে মেলে
নতুন প্রভাত আসে।

তোমার হাতের শব্দ গাঁথা
রাঙায় মধুর ছায়া,
সুর লহরী মনকে মাতায়
জাগায় প্রেমের মায়া।

উর্মিদোলায় দোলায়িত
গান কবিতার ভাষা,
হৃদয় কোণে উদ্ভাসনে
জাগায় বাঁচার আশা।

সত্য ন্যায়ের দীপ্ত পঙ্‌ক্তি
তোমার লেখায় পেয়ে,
অন্ধকার এই ভুবন মাঝে
আলোয় গেছে ছেয়ে।

তুমি রবি বিশ্বকবি
শব্দে শব্দে গাঁথা,
বিশ্ববাসীর হৃদয় মাঝে
তোমার আসন পাতা।

## প্রাণপ্রিয় নজরুল

### কাজল নিশি

গান কবিতা ছড়ার লেখক
প্রাণপ্রিয় নজরুল
যার লেখাতে ভাঙে মনের
হাজার রকম ভুল।

আপন মনে পড়ে শিশু
নজরুলেরই ছড়া
ছড়ার ভিতর ন্যায় ও নীতির
কথা লেখা কড়া।

নজরুল তুমি থাকবে ঠিকই
সব মানুষের মনে
তোমার আসন পাতা আছে
মনের সিংহাসনে।

প্রিয় কবি হয়ে অছো
আজীবনই তাই
প্রাণের মানুষ গানের মানুষ
তাইতো ভুলি নাই।

# ছোটোদের নজরুল

প্রফেসর আবদুল মান্নান

ছোট্ট বন্ধুরা, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং ছোটোদের জন্য কবিতা-ছড়া-গান ইত্যাদি তিনি কি দরদ দিয়ে লিখেছেন তা তুলে ধরব। তোমরা জানো, আমাদের জাতীয় কবি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন। ঐতিহ্যের ধারক-বাহক কাজী পরিবারে তাঁর জন্ম। নজরুল আট বছর বয়সে পিতৃহারা হন। পিতৃহারা নজরুল অভাবের সংসারের হাল ধরার নিমিত্তে মসজিদের খাদেম ও ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মাজারের খাদেম ও মক্তবের শিক্ষকতা করে সংসারের খরচ চালাতেন। চাচা বজলে করিম ফারসি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নিকট ফারসি ভাষা শিখতেন।

পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে আরবি, ফার্সি ও উর্দু, ভাষার সাথে সখ্যতা গড়ে উঠে। এ সময় তিনি গ্রাম্য লোকো নাট্যদলে যোগ দেন এবং কবিয়ালগিরি ও ছোটো নাট্যদলে যোগ দিয়ে ছোটো ছোটো নাটিকা লিখেন, অভিনয় করেন, বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কিছু ছড়া ও গান লিখেন। যেমন-

রবনা কৈলাশপুরে আই এ্যাম ক্যালকাটা গোয়িং
যতসব ইংলিশ ফ্যাশন
আহা মরি কি লাইটনিং...

ইসলামি ঐতিহ্য নিয়ে লেখা–

চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে
নামাজে জমি 'উগালে'
রোজাতে জমি 'সামালে'।

বন্ধুরা তোমরা জেনে বিস্মিত হবে যে, লেখার কারণে ইংরেজ সরকার তাঁকে দুইবার কারাগারে পাঠিয়ে ছিল। তবুও আমাদের জাতীয় কবি কখনো হার মানেননি।

তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য ছড়া, কবিতা গান রচনা করেন। তিনি উপলব্ধি করতেন এই শিশুরাই এক সময় আমাদের দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দেবেন। তিনি ছোটোদের জন্য গান লিখেছেন, তোমরা তা শুনে আনন্দিত ও পুলকিত হবা। যেমন তিনি লিখেছেন–

প্রজাপতি প্রজাপতি
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা
টুকটুকে লাল-নীল ঝিলিমিলি আঁকাবাঁকা।

তিনি শিশুদের জন্য প্রচুর ছড়া, কবিতা, গান রচনা করেন। তিনি ছোটোদের জন্য নাটক লিখেছেন, 'পুতুলের বিয়ে' ছোটোদের জন্য তাঁর লেখা কবিতা-ছড়া যেমন-চড়ুই পাখির ছানা, ঝিঙেফুল, খুকী ও কাঠবিড়ালি, খোকার খুশি, খাঁদু-দাদু, মা, খোকার বুদ্ধি, খোকার গপ্‌প বলা, প্রভাতী, লিচু চোর, পিলে-পটকা, কোলা ব্যাঙ, তাল গাছ, আমি যদি বাবা হতাম, সাতভাই চম্পা, শিশু যাদুকর, সংকল্প, কিশোরের স্বপ্ন, সারস পাখী, ছোটো হিটলার, নতুন পথিক, প্রজাপতি, চাকার গীত, লেটোর গান, রবনা কৈলাশপুর, পুতুলের বিয়ে, জুজু বুড়ীর ভয়, কে কি হবি বল, ছিনিমিনি খেলা, কানামাছি, নগর নামতা পাঠ, জাগো সুন্দর চিরকিশোর এরকম অগণিত লেখা ছড়িয়ে রয়েছে।

চড়ুই পাখির ছানা- এই ছড়া কবিতাটিতে কবি কি চমৎকারভাবে বাচ্চা আর মায়ের আকুতি তুলে ধরেছেন।

মস্ত বড়ো দালান-বাড়ির উই-লাগা ঐ কড়িক ফাঁকে
ছোট্ট একটি চড়াই-ছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মা'কে।
'চুঁচা' রবে আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন-বায়ে,
মায়ের পরান ভাবলে বুঝি দুষ্ট ছেলে নিচ্ছে ছা য়ে।
অমনি কাছের মাঠটি হতে ছুটল মাতা ফড়িং মুখে,
স্নেহের আকুল আশিস-জোয়ার উথ্‌লে ওঠে মা'র সে বুকে।

পুরো ছড়া-কবিতাটি পড়লে অবাক হতে হয়, কীভাবে মায়ের আকুতি তিনি এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঝিঙে ফুল নামে তাঁর অন্য একটি ছড়া কবিতায় অপূর্ব ছন্দে তুলে ধরেছেন। যেমন–

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ঝিঙে ফুল
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্নে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল-
ঝিঙে ফুল।

ছোটোদের জন্য কবির এমন মমত্ববোধ তাঁর বহু ছড়া-কবিতা-নাটিকায় তুলে ধরেছেন।

খুকী ও কাঠবিড়ালির ছড়া কবিতায় অতি চমৎকারভাবে খুকি তার মনের কথা তুলে ধরেছেন। কবি ছোটোদের মননকে এত সুন্দরভাবে এঁকেছেন, যা শিশুমনকে নাড়া দিয়ে যায়।

কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবিলেবু খাও?
বেড়াল-বাচ্চা কুকুর ছানা তাও?–

পুরো কবিতাটি পড়লে ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা অনেক মজা পাবে।

নজরুল তাঁর খাঁদু-দাদু ছড়া-কবিতায় মায়ের বাপকে নিয়ে অতি চমৎকার একটি রসিকতাপূর্ণ ডায়ালগ তৈরি করেছেন, যা পড়লে সোনামণিরা পুলকিত বোধ করবে। দেখুন– কেমন রসিকতা

ও মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা-নাক্ ডেঙ্গা-ডেং ড্যাং!

এভাবে তোমরা ছড়াটি পড়তে থাকো, দেখবে অসম্ভব মজার ছড়া।

নজরুল মা'কে নিয়ে ছোটোদের উপযোগী একটি অতি মনোরম কবিতা লিখেছেন, যাতে আমাদের সবার মনের কথা লুকিয়ে আছে। যেমন–

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,

নজরুলের বহু কবিতা, গান, ছড়ার পঙ্‌ক্তি প্রবাদ বাক্যের মতো। এই কবিতাটির দুটি লাইন দেখো, যা আমরা প্রবাদ বাক্য হিসেবেই এতদিন জেনে এসেছি।

মা'কে নিয়ে এত চমৎকার পঙ্‌ক্তি আর হতে পারে না।

যেমন–

হেরিলে মায়ের মুখ
দূরে যায় সব দুখ।

এর চেয়ে অতি সত্য কথা আর কি হতে পারে। পুরো কবিতাটি পড়লে মা'য়ের অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠে।

দেখো মা কি বস্তু
যখন জনম নিনু
কত অসহায় ছিনু।

এ রকম অসংখ্য পঙক্তি তোমরা পড়তে পড়তে পেয়ে যাবে। অন্য

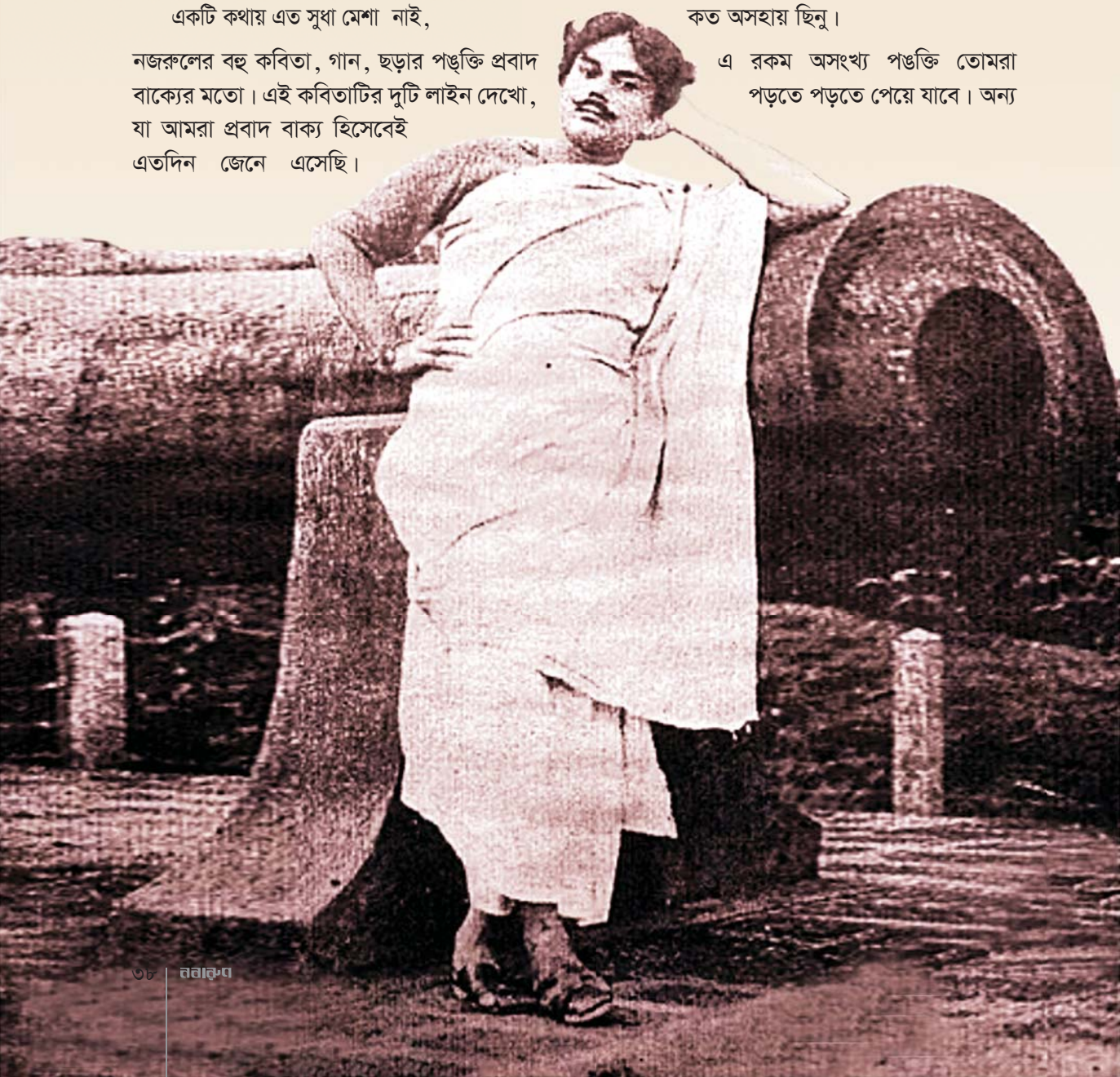

একটি ছড়া কবিতার নাম- খোকার গপ্‌প বলা দেখো সেখানে খোকা কি বলে

মা ডেকে কন্ 'খোকন-মণি! গপ্‌প তুমি জান?
কও তো দেখি বাপ।'
কাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ
বললে ক্ষুদে তান্‌সেন সে তান জুড়ে জোর দিল–
'একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল।'

নজরুলের লিচু চোর কবিতা পড়েনি এমন মানুষ বাংলায় না থাকার কথা। আমরা সবাই ছোটো বেলায় যারা গ্রামে ছিলাম সবার অভিজ্ঞতা 'লিচু চোর' কবিতার মতোই। অন্যের গাছের পেয়ারা, আম-জাম ইত্যাদি চুরি করা, না বলে খাওয়া একটা গ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রভাতী কবিতার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

ভোর হলো, দোর খোলো, খুকুমণি ওঠ রে!

এই কবিতার এক নৈশর্গিক আবেদন আমরা অনুভব করি। কালো জাম নিয়ে কি সুন্দর ছড়া লিখেছেন–

দেখো তার নমুনা–

কালো জামরে ভাই!
আম কি তোমার ভায়রা ভাই?...

ব্যাঙ নিয়ে কি চমৎকার ছড়া-কবিতা হতে পারে কল্পনা করা যায়!

ও ভাই কোলাব্যাঙ, ও ভাই কোলাব্যাঙ!
সর্দি তোমার হয় না বুঝি, ও ভাই কোলা ব্যাঙ,
সারাটি দিন জল ঘেঁটে যাও ছড়িয়ে দুটি ঠ্যাং।

পাঠ্যপুস্তক পড়ার আগ্রহ সব যুগে, সব সময়ে শিশুদের নিকট একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা। দেখো কবির কল্পনা 'তালগাছ' কবিতায়–

ঝাঁকড়া-চুলো তালগাছ, তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই?
আমার মত পড়া কি তোর মুখস্ত হয় নাই।

দেখো কি অসম্ভব উদ্ভাবনী শক্তি ও কল্পনা। শিক্ষকের পড়া দিতে না পারলে, টুলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখত কোনো কোনো শিক্ষক। এই শাস্তির কথা কি সুন্দরভাবে তিনি ছড়ায় তুলে ধরেছেন।

এবার দেখো বাবাকে নিয়ে কি রকম দুষ্টু বুদ্ধি–

আমি যদি বাবা হতুম,
বাবা হতেন খোকা
না হলে তার নামতা,
মারতাম মাথায় টোকা।

কি অপূর্ব চিন্তা শক্তি। যা বাংলা সাহিত্যে তথা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল।

সাত ভাই চম্পা-নামক কবির একটি কবিতা আছে। দুর্ভাগ্য চার ভাইয়ের স্বপ্ন পর্যন্ত তিনি লিখতে পেরেছেন, বাকিটা লিখার সময় সুযোগ তাঁর হয়ে ওঠেনি।

প্রথম ভাই

-আমি হব সকাল বেলার পাখি।
সবার আগে কুসুমবাগে
উঠব আমি ডাকি!
দ্বিতীয় ভাই
-আমি হবো গাঁয়ের রাখাল ছেলে
বলব 'দাদা প্রণাম তোমায়, ঘুম ভাঙিয়ে গেলে।
তৃতীয় ভাই
-আমি হব দিনের সহচর
বলব ওরে রোদ উঠেছে লাঙল কাঁধে ধর।
চতুর্থ ভাই
-আমি সাগর পাড়ি দেবো, আমি সওদাগর।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।

এভাবে বাকি তিন ভাইয়ের স্বপ্ন তিনি আঁকতে পারেননি বা সময় পাননি।

তোমাদেরকে কবির একটি অজানা তথ্য জানাতে চাই। কবি নজরুল আমাদের মহানবিকে নিয়ে অনেক গজল-গান-কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল মহানবি (সা.) কে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা কবিতার মাধ্যমে। আমাদের দুর্ভাগ্য কবি তা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। মাত্র মহানবির ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত কবিতা লিখেছেন, আসল সময় নবুয়ত প্রাপ্তির পরের জীবন লিখতে পারেননি।

দুর্ভাগ্য বাংলা সাহিত্যের এবং দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা একটা মহাকাব্য থেকে বঞ্চিত হলাম। মাত্র

২৬ বছরের জীবনী নিয়ে 'মরুভাস্কর' নামক অসমাপ্ত কাব্যটি আমাদের সামনে রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ও আমাদের আরেকটি দুর্ভাগ্য, কবি নজরুল মহাগ্রন্থ আল কোরান কবিতাকারে অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাও তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। মাত্র সুরা ফাতেহা ও আল কোরান শেষ পারা অর্থাৎ ৩০তম পারা তিনি অনুবাদ করে গেছেন, যার নাম 'কাব্য আমপারা'।

ছোট্ট বন্ধুরা, এই মহান কবি তোমাদের জন্য অসংখ্য লিখনি রেখে গেছেন। তাঁর অত্যন্ত বিখ্যাত ছড়া-কবিতা 'শিশু যাদুকর' পড়লে তোমরা বিস্ময়ে অবাক না হয়ে পারবে না। কি তাঁর অসম্ভব কল্পনা শক্তি। শোনা যায়, কবির বন্ধু শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের প্রথম ছেলে মোস্তফা কামাল (এই নামটিও নজরুলের দেওয়া) কে জন্মের পর কোলে নিয়ে এই কবিতাটি তিনি রচনা করেন। তোমরা জেনে খুশি হবে এই মোস্তফা কামালই আমাদের দেশের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। কবিতার কিছু অংশ শোনো–

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর!

নজরুলের 'সংকল্প' কবিতা পড়েছ? পড়তে গেলে তোমরা অন্যরকম এক নজরুলকে খুঁজে পাবে। যেমন–

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে-
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে...

সবার বিস্ময় হলো নজরুল ৩০ এর দশকে কল্পনা করেছেন বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পুরবে, আজ আমরা হাতের মুঠোয় মোবাইলের মাধ্যমে সারা বিশ্ব দেখছি। যা কবির কল্পনায় ছিল ৭০/৮০ বছর পূর্বে।

তাঁর ছোটো হিটলার পড়ে–দেখো কি বলে–

মাগো অমি যুদ্ধে যাব, নিষেধ কি মা আর মানি?
রাত্রিরে রোজ ঘুমের মাঝে ডাকে পোল্যান্ড জার্মানি।

কবির 'নতুন খাবার' কবিতা? দেখো কি চমৎকার উচ্চারণ–

কম্বলের অম্বল
কেরোসিনের চাটনি,
চামচের আমচুর–
খাইছ নি নাতনি?

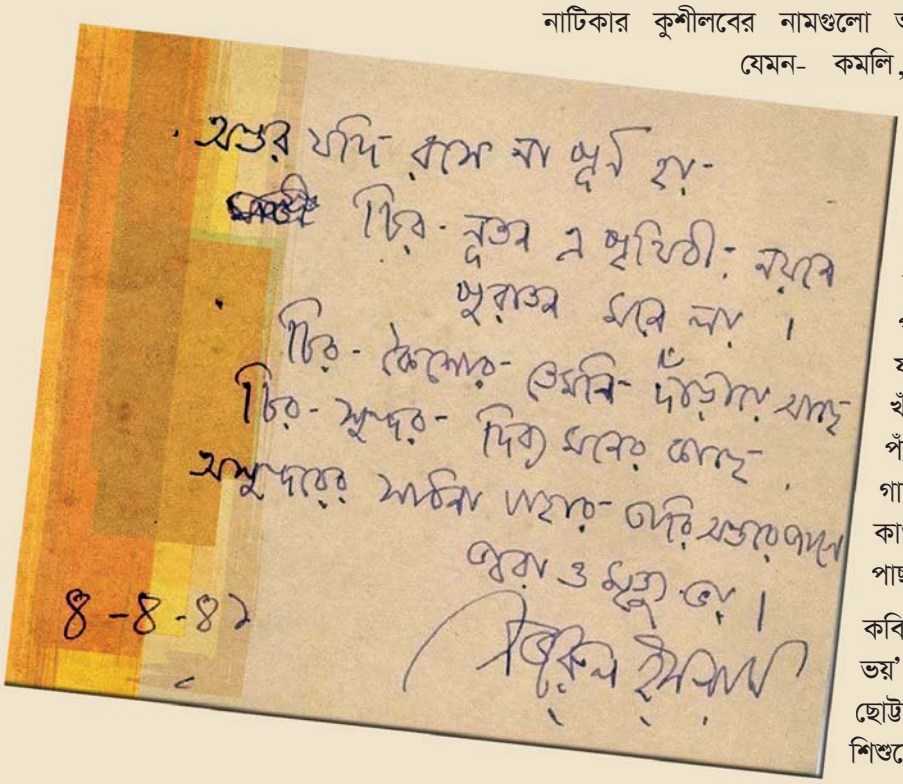

মায়েরা বাচ্চাদের ঘুম পড়ানোর জন্য কত গল্প-গান বাঁধে। দেখো কবি মায়েদের জন্য কি সুন্দর একটি গান বেঁধেছেন–

ঘুম-পাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো।

বাংলার সকল মায়ের গলায় শিশুকে ঘুম পাড়াতে এই গান বাজে। 'কোথায় ছিলাম আমি' কবিতায়। দেখো তাঁর কল্পনা–

মা গো! আমায় বলতে পারিস কোথায় ছিলাম আমি–
কোন না-জানা দেশ থেকে তোর কোলে এলাম নামি?
আমি যখন আসিনি, মা তুই কি আঁখি মেলে
চাঁদকে বুঝি বলতিস-ঐ ঘর-ছাড়া মোর ছেলে?

ছোটো মেয়েদের নিয়ে কবি 'পুতুলের বিয়ে' নামক একটি নাটিকা রচনা করেছেন, যা খুবই সুন্দর ও মজাদার।

নাটিকার কুশীলবের নামগুলো অতি চমৎকার। যেমন- কমলি, টুলি, পঞ্চি, খেঁদি, বেগম। নাটিকার একটি হাসির গান শোনো–

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়
যাইতে যাইতে খ্যাঁচখ্যাচায়
প্যাঁচায় গিয়া উঠ্‌ল গাছ,
কাওয়ারা সব লইল পাছ। ইত্যাদি---

কবির 'জুজুবুড়ীর ভয়' আরো একটি ছোট্ট নাটিকা। যা শিশুদের মনোরঞ্জণের জন্য মনোমুগ্ধকর। চরিত্রগুলো এক বিচিত্র ও ইন্টারেস্টিং। যেমন–ন্যাড়া, হেবো, পুঁটো, মা, খুকি ইত্যাদি। পুঁটো একটি ছড়া গান গায়-দেখো কি চমৎকার–

ছেলকপাটি বৃন্দাবন
ছেনকপাটি দাঁত কপাটি
ন্যাড়া মাথায় মারব চাঁটি।

আম পাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়বে ঘোড়া।

কবির আরো একটি ছড়া-কবিতা শোনো কি চমৎকার–কে কি হবে বল।

বোন সাত ভাই চম্পা কে কি হবি বল...
প্রথম ভাই-আমি হব কাবলীওয়ালা
দ্বিতীয় ভাই-আমি হবো পণ্ডিত মশাই...
তৃতীয় ভাই-আমি হবো ফেরীওয়ালা...
চতুর্থ ভাই-আমি হবো জজ সাহেব...
পঞ্চম ভাই-দারোগা আমি...
৬ষ্ঠ ভাই-আমায় দেখে দারোগা গুড়ুম,
সপ্তম ভাই-আমি হবো বাবার বাবা...

ছোটোবেলায় কানামাছি খেলে নাই এমন ছেলে-মেয়ে এই বাংলায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে বিখ্যাত ছড়াটি সবার মুখে মুখে আজ ৮০/৯০ বছর সেটাকে আমাদের জাতীয় কবি লিখেছেন তা অধিকাংশ মানুষই জানে না এমনকি আমি নিজেও এর আগে জানতাম না। তাঁর রচনাবলি পাঠের পরই জানতে পারলাম এটা নজরুলের লিখা। দেখো কি চমৎকার ছড়া–

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ী
রেলগাড়ি ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।

কবির আরেকটি বিখ্যাত ছড়া শোনো, নবাব নামতা পাঠ–

একেক্‌কে এক-
বাবা কোথায়, দেখ!
দুয়েক্‌কে দুই-
নেই ক? একটু শুই!
তিনেক্‌কে তিন–
উহুহু! গেছি!–আলপিন
চারেক্‌কে চার-
ঐ ঘরে আচার!
পাঁচেক্‌কে পাঁচ-
হুই দেখ্ কুলের গাছ।
ছয়েক্‌কে ছয়-
বাবা গুড বয়।
সাতেক্‌কে সাত-পণ্ডিত মশাই কাত!
আটেক্‌কে আট-
আমি বড় লাট।
নয়েক্‌কে নয়-
আর একটু ভয়।
দশেক্‌কে দশ-
বাবা আপিস! ব্যস!

সকল শিশুদের মনের কথা এটা।

কবির আরো একটি সুন্দর নাটিকা আমরা পাই যার নাম 'জাগো সুন্দর চিরকিশোর'। এভাবে কবি জাতীয় জাগরণে যেমন ভূমিকা রেখেছেন, তেমনি শিশু-কিশোরদের মানস গঠনে বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন। শিশু-কিশোরদের মনন তৈরিতে তাঁর দান অপরিসীম। আরো অগণিত শিশু-কিশোর উপযোগী লিখা তাঁর রচনা সম্ভারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাঁর এ অবদান বাংলা সাহিত্যে বিরল।

বন্ধুরা, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর গান-কবিতা আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর অগ্নিঝরা লিখনী ইংরেজদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। যার কারণে তাঁকে একাধিকবার কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, তাঁর বই বাজেয়াপ্ত করেছিল।

২০২৪-এর ছাত্র-গণআন্দোলনে আমরা তাঁর কবিতা-গান থেকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছি। যা আমাদের জুলাই আন্দোলনের এক বিশাল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। ঢাকার দেয়ালগুলোতে তোমরা নজরুলের সেসব অগ্নিঝড়া লিখনী দেখতে পাবা। আমরা এই বীর মহাকবির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। তিনি আজীবন বাংলার ঘরে ঘরে এক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। ❑

---

প্রফেসর, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা

# মা পাখিদের কথা

## রুবাইয়াত খান

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা পৃথিবীতে চিরন্তন ও শ্বাসত। একটি মানবশিশু জন্মদানের পর একজন মা যেমন তার সদ্যোজাত সন্তানের খাওয়ানো থেকে শুরু করে লালন-পালনের সবরকম ব্যবস্থা করে থাকেন, তেমনি পাখিদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। মা পাখিরা তাদের বাচ্চাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে ও নিরাপত্তার জন্য তাদের আগ্রাসী মনোভাব সেই চিরন্তন সত্যকেই বার বার প্রমাণ করে।

বিশ্বে প্রায় ৯,০০০ প্রজাতির পাখির রয়েছে, যারা ডিম উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের প্রজাতির বংশ বিস্তার করে চলছে । দেয়ালের ছিদ্র, গলি পথ বা সুরঙ্গ থেকে শুরু করে গাছের মগডালে- সব জায়গাতেই পাখিদের অবাধ বিচরণ। অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পাখি তার নিজের সুবিধা মতো জায়গায় বাসা তৈরি করে সেখানে ডিম পাড়ে এবং নিজের দেহের তাপে অর্থাৎ, তা দিয়ে ডিম ফোটানোর ব্যবস্থা করে থাকে। ডিম থেকে যখন বাচ্চা ফুটে বেরিয়ে আসে, তখন মা পাখির দায়িত্ব পড়ে তার বাচ্চাদের লালন-পালন ও বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করা।

কিছু কিছু পাখি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, যেমন: কোকিল ও বউ-কথা-কও পাখির মতো কিছু পাখি রয়েছে যারা নিজেরা বাসা তৈরি না করে কাক বা অন্য পাখিদের বাসায় ডিম পাড়ে। এরপর অপেক্ষা করতে থাকে কবে তাদের ডিমগুলোতে বাচ্চা ফুটে বেরিয়ে আসবে। এজন্য তারা ঐসব পাখির বাসার আশেপাশে থেকে সবসময় খেয়াল রাখে যেন তাদের ডিমগুলো এবং বাচ্চাদের কোনো ক্ষতি না হয়।

বিভিন্ন প্রজাতির পাখির বাচ্চাদের সাধারণত 'অ্যালট্রিকাল' এবং 'প্রিকোসিয়াল'- এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। 'অ্যালট্রিকাল' শ্রেণীর পাখির বাচ্চারা দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। জন্মাবার পর এই শ্রেণীর পাখির বাচ্চাদের শরীরে পালক থাকে না,

একেবারে অসহায় থাকে এমনকি চোখও ফোটে না। এরা শুধু মুখে হাঁ করতে পারে। মা পাখিরা ঠোঁটের সাহায্যে তাদের এসব বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দিতে থাকে। যেমন ময়ণা, টিয়া দোয়েল,বাজিগর ককাটেল,শালিক, হেরন, বাজপাখি, পেঁচা এবং কোনো কোনো সামুদ্রিক পাখি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

আর এক শ্রেণীর পাখির বাচ্চাদের বলা হয় 'প্রিকোসিয়াল'। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে হাঁস ও মুরগির ছানা। এদের গা পালকে ঢাকা থাকে, এদের চোখ দুটো উজ্জ্বল; এরা ডিম ফুটে বের হবার পর থেকেই মায়ের পিছু পিছু দৌড়াতে পারে এবং ঠোঁট দিয়ে খাবার খুঁটে নিতে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, প্রিকোসিয়াল শ্রেণীর পাখির বাচ্চাদেরই শৈশব বেশিদিন স্থায়ী হয় এবং অ্যালট্রিকাল শ্রেণীর পাখির বাচ্চারা ওদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে ওঠে। আবার এই দুই শ্রেণীর বাচ্চাদের প্রজাতিভেদেও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, কোনো কোনো পাখি বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্য ৯০০ বারও ওড়াওড়ি করে। অন্যদিকে আবার ঈগল পাখি মাত্র দু-তিনবার চক্কর কাটে সারাদিনে। ওরা এটুকু সময়েই যে শিকার নিয়ে আসে, তা বাচ্চাদের পেট ভরার পক্ষে যথেষ্ট। বাচ্চাদের খাবার এবং সুরক্ষার জন্য মা ঈগলের পাশাপাশি বাবা ঈগলও সমান ভূমিকা পালন করে থাকে। যখন মা ঈগল খাবার সংগ্রহ করতে যায়, তখন বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব বাবাটির উপর বর্তায়।

কিছু পাখির বাচ্চাকে দুই থেকে তিন সপ্তাহ ধরে মা পাখিকে খাবার সংগ্রহ করে খাওয়াতে হয়। তারা জন্মাবার নয় দিন পরেই বাসা ছেড়ে উড়তে শেখে। পাখি অ্যালবাট্রস সমুদ্রতীরের পাখি হলেও বাচ্চা দেওয়ার জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা তাদের পছন্দ। জন্মাবার তিন থেকে দশমাস পরেই প্রজাতিভেদে বাচ্চা আলবাট্রস প্রথমবার সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে শেখে। ওরা ঠিকমতো উড়তে এবং বেঁচে থাকতে পারবে কিনা, তা এই প্রথমবার ওড়ার কয়েকমাসের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যায়।

বেশিরভাগ পাখিই বাসায় ঠোঁটে করে পোকামাকড় এনে বাচ্চাদের খাওয়ায়। কিন্তু সামুদ্রিক কোনো কোনো পাখি আবার খাবার গিলে ফেলে বেশ খানিকটা হজম করে নেয়, তারপর সেটা উগরে দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়। এর ফলে পাখিরা বেশি খাবার বহন করতে পারে সেইসাথে বাচ্চারাও খানিকটা পরিপাক করা খাবার খেতে পায়। এতে বাচ্চাদের খাবার তাড়াতাড়ি হজম হয়।

সি-গাল এবং সারসরা খাবার এনে বাচ্চাদের সামনে দেয় এবং বাচ্চারা সেই খাবার খেয়ে নেয়। খাবার খাওয়ানো ছাড়াও মা পাখিরা বাচ্চাদের উড়তে এবং খাদ্য সংগ্রহের কৌশল শিখায়। এছাড়া পাখিরা তাদের বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য সবরকম চেষ্টাই করে। সি-গাল পাখির শাবকেরা প্রায় তিন মাস পর্যন্ত তাদের বাবা-মায়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকে।

জন্ম থেকেই সাবলম্বী বাচ্চাদের নিয়ে মা পাখিকে একটু মুশকিলে পড়তে হয়। সেজন্য তাকে কী খেতে হবে, কী খেতে হবে না তা শেখানোর দায়িত্ব পড়ে মায়েদের। অনেক সময় ছড়িয়ে থাকা খাবার সংগ্রহের কৌশল শেখানোয় ব্যস্ত থাকতে হয় মা-বাবাদের। এভাবে পাখির বাচ্চারা তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকেই খাদ্য সংগ্রহের কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে। ❑

প্রাবন্ধিক

গল্প

# বিড়ালের কীর্তি

## ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ

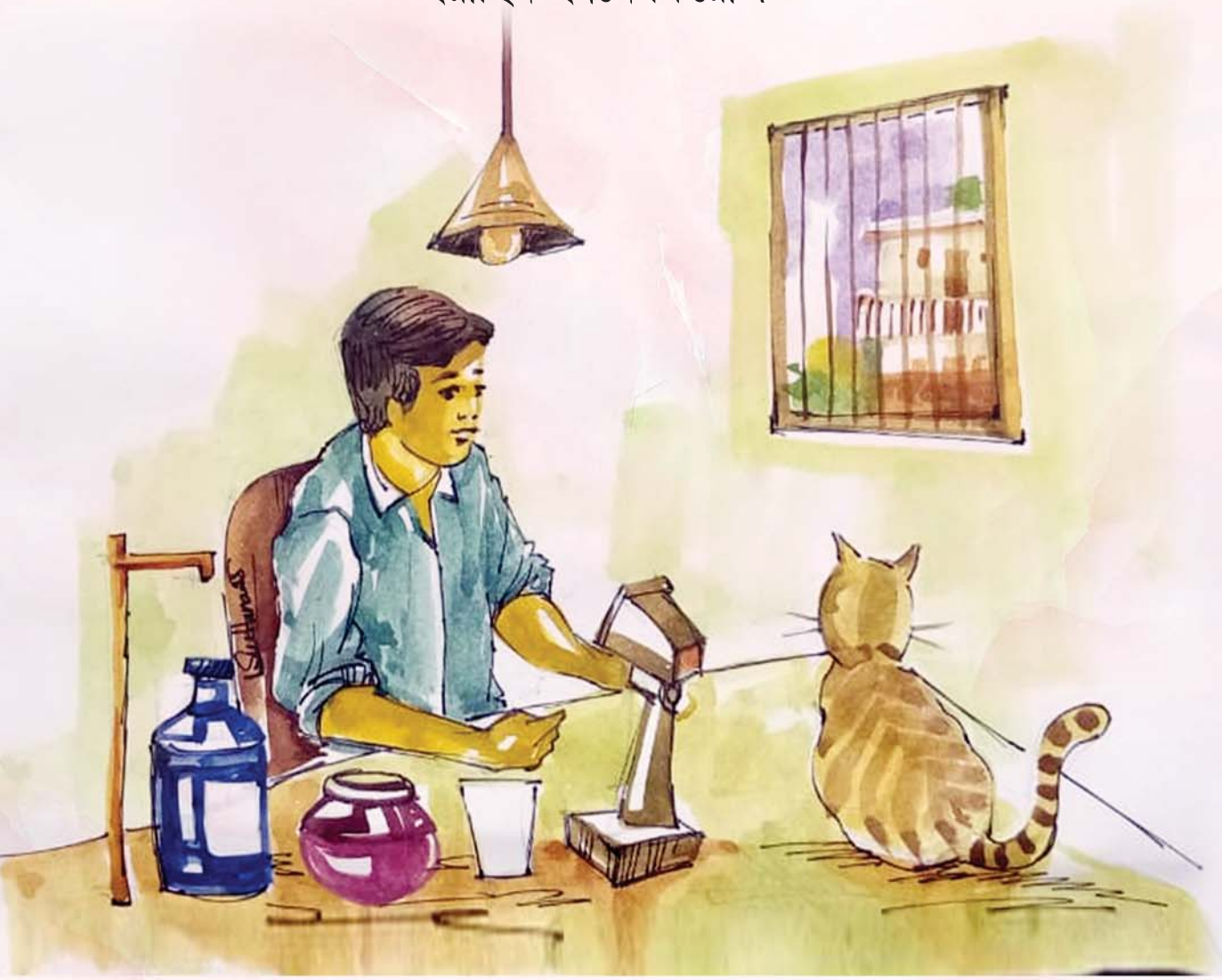

শহরের এক কোণে পুরনো দোতলা বাড়ি। চারদিকে গাছপালায় ঘেরা, রাত হলে জায়গাটা আরও বেশি ভয়ানক মনে হয়। এখানে থাকে কিশোর রহিত আর তার পোষা বিড়াল 'স্নো'। রহিতের বাবা-মা দুজনই গবেষক, তাই বাড়ির নিচতলায় তাদের বিশাল লাইব্রেরি আর ল্যাবরেটরি। স্নো শুধু সাধারণ বিড়াল নয়, তার কিছু অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা আছে। রহিত মাঝেমধ্যে মনে করে স্নো যেন সবকিছু বোঝে! একদিন শহরে একের পর

এক চুরির ঘটনা ঘটতে শুরু করল। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, চোরেরা কোনো দরজা বা জানালা ভাঙে না, কিন্তু মূল্যবান জিনিস উধাও হয়ে যায়। পুলিশ হিমশিম খাচ্ছে, কিন্তু কোনো সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। রহিত এই সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। রাতে যখন সে পড়ার টেবিলে বসে, স্নো এসে টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠল। হঠাৎ করেই সে জানালার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রহিত জানালা দিয়ে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না, কিন্তু বিড়ালটা যেন কিছু একটা টের পেয়েছে।

পরদিন সকালে রহিত এক চাঞ্চল্যকর খবর পেল। তার পাশের বাড়ির বিজ্ঞানী রফিকের গবেষণাগার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি চুরি হয়েছে! রহিত আর স্নো তখনই সেখানে ছুটল। রফিকের বাড়িতে ঢুকেই রহিত চারপাশ খেয়াল করতে লাগল। কিন্তু কিছুই সন্দেহজনক মনে হলো না। হঠাৎ স্নো মিউ মিউ করে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করল। সে সোজা জানালার পাশে গিয়ে থামল, তারপর মেঝের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাবা দিয়ে ঘষতে লাগল। রহিত সেখানে হাত দিয়ে দেখতেই বুঝল মেঝেতে ক্ষীণ একটা দাগ! সে রফিককে জানালো, 'স্যার, এখানে একটা গোপন দরজা থাকতে পারে!' রফিক অবাক হয়ে বললেন, 'আমার তো জানা নেই এখানে কিছু আছে!'

সবাই মেঝেতে ঠোকাঠুকি করতেই খচ করে একটা শব্দ হলো। সত্যিই একটা গুপ্ত দরজা! দরজাটা খুলতেই নিচে একটা সিঁড়ি দেখা গেল। রহিত, রফিক আর স্নো ধীরে ধীরে নেমে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে রহিতরা একটা ছোট্ট ঘরে পৌঁছালো। ঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু স্নো তার চোখ বড়ো বড়ো করে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। হঠাৎ-ই কোণার দিকে থাকা একটা ছায়া নড়ল! রহিত দ্রুত টর্চ জ্বালাতেই দেখা গেল একজন মুখোশধারী লোক সেখানে দাঁড়িয়ে! লোকটা পালানোর চেষ্টা করতেই স্নো এক লাফে তার হাত আঁচড়ে দিল। ব্যথায় লোকটা চিৎকার করল, আর ঠিক তখনই রহিত তার মোবাইল বের করে পুলিশকে ফোন দিল। পুলিশ এসে ধরা পড়া চোরের মুখোশ খুলে দিল। এটা ছিল রফিকেরই এক সহকারী, যে গোপনে তার গবেষণার মূল্যবান যন্ত্রপাতি চুরি করছিল!

স্নো'র তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর বিচক্ষণতার জন্য রহিত এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। পুলিশের অফিসার বিস্ময় ভরে বিড়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এমন চতুর বিড়াল আমি আগে দেখিনি!' রফিক স্নো'র মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'এটা শুধু একটা বিড়াল নয়, একজন প্রকৃত গোয়েন্দা!' রহিত হাসল। তার ছোট্ট সঙ্গী স্নো যে সত্যিকারের বুদ্ধিমান, সেটা আজ সবাই বুঝেছে।

স্নো'র বুদ্ধিমত্তায় রহস্যের সমাধান হয়ে গেলেও রহিতের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল, চোর কেবলমাত্র গবেষণাগারের জিনিসপত্রই চুরি করছিল কেন? টাকাপয়সা বা অন্যান্য মূল্যবান জিনিসে তার কোনো আগ্রহ ছিল না! পরদিন সকালে রহিত যখন তার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল, তখন সে খেয়াল করল স্নো ছাদে বসে নিচের গলির দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক আগের রাতের মতো। রহিত কৌতূহলী হয়ে নিচে নেমে গেল। গলিতে গিয়ে দেখে, একটা কালো গাড়ি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। রহিত সন্দেহ করল, কিন্তু গাড়ির নম্বর ভালো করে দেখতে পেল না। ঠিক তখনই স্নো গলির এক কোণে দৌড়ে গেল এবং থামল একটা কাগজের টুকরোর সামনে।

রহিত কাগজটা হাতে নিতেই চমকে উঠল। সেখানে একটা ম্যাপ আঁকা, আর কিছু গাণিতিক সংকেত লেখা! রহিত ম্যাপটা নিয়ে রফিকের কাছে গেল। 'রহিত তখনই বুঝতে পারল, চোর কেবল একজন সাধারণ সহকারী ছিল না। তার পেছনে আরও বড়ো কেউ আছে, যে গবেষণার গোপন তথ্য হাতিয়ে নিতে চাচ্ছে! স্নো তখন রহিতের পাশে এসে তার লেজ দোলাতে লাগল, যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে 'এই রহস্য এখনও শেষ হয়নি!'

রহিত আর রফিক তখনই পুলিশের কাছে গেল। তারা ম্যাপটা পরীক্ষা করল, কিন্তু বুঝতে পারল না এটি কোথাকার। পুলিশের এক অফিসার বললেন, 'এটা কোনো গোপন গবেষণাগারের মানচিত্র হতে পারে।

তবে কোথায়, সেটা বের করতে হবে!' রহিত বাড়ি ফিরে স্নো'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই না থাকলে তো আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না, বন্ধু!' স্নো মিউ মিউ করে সাড়া দিল, তারপর জানালার পাশে গিয়ে বসে বাইরে তাকাতে লাগল।

রাত বাড়তেই রহিত লক্ষ করল, স্নো আবার জানালার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। রহিতও এক ঝলক বাইরে তাকিয়ে দেখল একজন কালো পোশাকধারী লোক তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে! সে দ্রুত মোবাইল বের করে ছবি তুলতে গেল, কিন্তু তখনই লোকটি গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'ব্যাপারটা ধীরে ধীরে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে', রহিত নিজেকে বলল। পরদিন সকালে সে রফিকের সাথে ম্যাপের গাণিতিক সংকেত বিশ্লেষণ করতে বসল। হঠাৎ-ই রহিত চমকে উঠল! 'স্যার, এই সংকেত তো জিপিএস কো-অর্ডিনেটের মতো দেখাচ্ছে!'

সংকেত বিশ্লেষণ করে রহিত বুঝতে পারল, এটি শহরের অদূরে একটি পরিত্যক্ত কারখানার অবস্থান দেখাচ্ছে। 'আমাদের সেখানে যাওয়া দরকার!' রহিত বলল। রফিক কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু রহিতের আত্মবিশ্বাস দেখে রাজি হলেন। পুলিশের সাহায্য নিতে তারা দেরি করল না। রাতের বেলা রহিত, রফিক, চারজন পুলিশ অফিসার, আর অবশ্যই স্নো সেই পরিত্যক্ত কারখানার দিকে রওনা দিল। গাড়ি থেকে নেমেই স্নো দ্রুত ছুটে গিয়ে মিউ মিউ করতে লাগল। সে কারখানার এক গোপন দরজার সামনে গিয়ে থামল।

এই দরজার পেছনেই কিছু একটা আছে! রহিত ফিসফিস করে বলল। পুলিশ দরজাটি খুলতে গেল, ঠিক তখনই ভেতর থেকে আওয়াজ এল।

'তোমরা ভুল জায়গায় চলে এসেছ!'

অন্ধকার কারখানার ভেতর থেকে ভেসে আসা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে সবাই থমকে গেল। পুলিশের অফিসাররা অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হলো, আর রহিত স্নোকে বুকে জড়িয়ে ধরল। 'তোমরা চলে যাও, না হলে পরিণতি ভালো হবে না!' ভেতর থেকে আবার শোনা গেল।

পুলিশ কোনো কথা না বলে দরজা ঠেলে খুলে ফেলল। বিশাল ঘরটার মধ্যে কয়েকজন মুখোশধারী লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনে একটা টেবিল, যেখানে কিছু যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে আছে। রহিত এক ঝলকে বুঝতে পারল এগুলো চুরি হওয়া গবেষণার যন্ত্রপাতি!

হঠাৎ স্নো মিউ মিউ করতে করতে রহিতের কোল থেকে লাফিয়ে পড়ল। সে সোজা ছুটে গিয়ে টেবিলের ওপর থাকা একটা কন্ট্রোল প্যানেলে থাবা দিয়ে আঘাত করল! এক মুহূর্তের মধ্যেই প্যানেল থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে বের হলো, আর কারখানার বিদ্যুৎ চলে গেল!

ঘোর অন্ধকারে মুখোশধারীরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ল।

'এটাই সুযোগ!' পুলিশের অফিসার ফিসফিস করে বললেন। পুলিশ দ্রুত টর্চ জ্বালিয়ে অপরাধীদের ঘিরে ফেলল। মুখোশধারীরা পালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু স্নো এবার আরেকটা চাল দিল, সে আরেকজনের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে দিল। ব্যথায় লোকটা চিৎকার করে পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাকে ধরে ফেলল। বাকি সবাইকেও দ্রুত পাকড়াও করা হলো। পুলিশ তাদের হাতকড়া পরিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল।

একজন মুখোশধারী স্বীকার করল, 'আমরা এই প্রযুক্তি বিক্রি করার জন্য চুরি করেছিলাম। কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিমান বিড়াল আমাদের সব প্ল্যান নষ্ট করে দিল!' পুলিশের অফিসার আফজাল বিস্মিত হয়ে স্নো'র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এমন চতুর বিড়াল আগে দেখিনি!'

সকালবেলা পুলিশের গাড়িতে অপরাধীদের ধরে নিয়ে গেল। রফিক যন্ত্রপাতি ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

রহিত স্নোকে কোলে নিয়ে বলল, 'তুই না থাকলে আমরা কিছুই পারতাম না, বন্ধু!'

স্নো মিউ মিউ করে রহিতের গালে মুখ ঘষে দিল, যেন বলছে 'তোমার ওপর আমার ভরসা আছে!' ❑

---

শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

গল্প

# নীলু এবং এক আঁজলা জল

সুবর্ণা দাশ মুনমুন

সে অনেক দিন আগের কথা। দূরের এক গাঁয়ে ছিল তার বাস। বিনুনি দোলানো ছোট্ট মেয়েটির নাম নীলু। বাবা- মা ছিল না তার। আপন বলতে শুধু এক দাদু। বাবা- মা না থাকলে কী হবে-গাছ, ফুল,পাখি, নুয়ে পড়া লতা, ভোরের শিশির সবাই তার পরম বন্ধু। চলার পথে গাছের শাখা মাথা নুইয়ে পথ আগলাতো তার। মন খারাপ হলেই নেমে আসত প্রজাপতির দল। হাসি, গান আর আনন্দে ভরিয়ে দিত তার মন। এমন করে ফুল, পাখি আর প্রজাপতিদের সাথে হেসে-খেলেই দিন কাটত তার।

একদিন হঠাৎ যেন সব থমকে গেল। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। নেই গাছেদের প্রাণ জুড়ানো বাতাস। চারিদিকে শুধু হাঁসফাঁস করা গরম। সেই গরমে গাছ, ফুল, প্রজাপতি সব মরোমরো। বড়ো বড়ো গাছেরা তাদের হলদে পাতা ঝড়িয়ে দিয়ে শ্বাস নিতেই ছটফট করছে। ছোটো পাখি, প্রজাপতি, ফুল সবাই যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। প্রচণ্ড গরমে শুকিয়েছে নদীনালা, পুকুর সব। একদিকে পানির তৃষ্ণা অন্যদিকে বাতাস না থাকায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল গ্রামের বৃদ্ধ আর কচিকাচাদের। মানুষ, পশুপাখি কারও মনে এতটুকু শান্তি নেই।

আর নীলু পড়ল মহাচিন্তায়। তার বৃদ্ধ দাদুর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। যে করেই হোক তার দাদুকে বাঁচাতেই হবে। তা নাহলে এ জগতে যে তার আর আপন বলে কেউ থাকবে না। মনে মনে ভাবল সে, নদীর কালো জল অথবা বুড়ো বটগাছ নিশ্চয়ই বলতে পারবে, কোথায় গেলে দাদুর জন্য একমুঠো বাতাস পাওয়া যাবে? নদী, মাঠ পেরিয়ে চলল মেয়ে। সব শুকিয়ে চৌচির। ধানক্ষেতের আল পেরোতে গিয়ে কষ্টে তার বুক ভেঙে গেল। কচি কচি সবুজ ধান শিশুরা প্রচণ্ড গরমে মাটির সাথে মিশে গেছে। নদীর জল আজ আর কলকল করে কথা কইল না তার সাথে। ঘাটে বাঁধা একলা নৌকো। তারও আজ মন ভালো নেই। বুড়ো বটের কাছে যেতেই বট তার নেতিয়ে পড়া গুড়ি দিয়ে আলতো আদরে জড়িয়ে ধরল তাকে। নীলু বলল, বটগাছ তুমি নিশ্চয়ই জানো, কোথায় গেলে একমুঠো বাতাস মিলবে?

বুড়ো বট খকখক করে কাশল। কিছুক্ষণ পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল, শোনো মেয়ের কথা। আমি যদি জানি কোথায় বাতাস পাওয়া যায়, তবে কি বাতাসের অভাবে নিজেই অত কষ্ট পাই?

মন খারাপ করে নীলু আবার চলতে শুরু করল বনের পথ ধরে। প্রচণ্ড গরমে বনের সবুজ গাছেরা যে যেখানে পেরেছে লুটিয়ে পরেছে। নীলু'র সাথে তারা আজ আর কেউ কথা বলল না।

গভীর বনে ঢুকতে গিয়ে নেতিয়ে পড়া বড়ো একটা গাছের গুড়ির নিচে দেখতে পেল ছোট্ট এক চারাগাছ। কচি সবুজ পাতা গুলো কেমন মন খারাপ করে ঝিমোচ্ছে। মেয়েটি তাকে পেরিয়ে যাবে অমনি চারাগাছ তাকে ডাক দিল, এই যে খুকু আমায় কি একটু জল খাওয়াতে পারো? আমার না প্রচণ্ড জল তেষ্টা পেয়েছে। আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে আমিও বড়ো বড়ো গাছগুলোর মতো নুইয়ে পরব।

নীলু কিছু না ভেবেই বলল, সে আর এমনকি? একটু অপেক্ষা করো। এখনি জল আনছি তোমার জন্য। ঘুরপথে আবার চলল মেয়ে নদীর দিকে। চারাগাছটাকে যে বাঁচাতেই হবে। প্রচণ্ড গরমে টলতে টলতে যখন সে পৌঁছালো নদীর ধারে ততক্ষণে তার পায়ে ফোস্কা পড়েছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। ছোট্ট দু'হাতের আজলা ভরে জল নিয়ে আবার রওনা দিল বনের পথে। তার ছোটো দুটো হাত গলে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে গেল অনেকখানি জল।

পথে পড়ল সেই বুড়ো বটগাছ। বলল মেয়ে, আমায় কি এক ঢোক জল খাওয়াতে পারো? তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটল বলে। কতদিন হলো একটু বৃষ্টি নেই। আবার আমারও এমন সাধ্যি নেই যে একটু এগিয়ে জল খুঁজে নেবো। নীলু তার দু'হাতের আজলা থেকে একটু খানি জল বটের গোড়ায় ঢেলে দিল। অমনি বটের নুয়ে পরা ডালপালাগুলো সতেজ হয়ে উঠল। প্রাণজুড়ানো বাতাসের সাথে শাখা নুইয়ে বার বার ছোটো মেয়েটার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল বটগাছ।

মেয়ে আবার চলতে শুরু করল বনের দিকে। কিছুদূর যেতেই পিছন থেকে ডাক দিল এক লম্বা তালগাছ। বলল মেয়ে বড্ড কষ্ট হচ্ছে গো, তোমার ওই হাত থেকে একটু জল আমায় দাও না। ছোট্ট মেয়েটা এবার ভাবতে লাগল, বটকে দেবার পর এইটুকু জলই তো আছে। তাও যদি দিয়ে দিই, চারাগাছের জন্য যে কিছুই থাকবে না। অনেক ভেবে বাকি জলটুকু তালগাছকে দিয়ে আবার মেয়ে নদীর দিকে যাবে ভাবছে, অমনি তার আজলা ভরে উঠল জলে। সেই জল পেয়ে চারাগাছ আবার আনন্দে ঝলমল করে উঠল। সারা বনে শুরু হলো মিষ্টি হাওয়ার মাতামাতি। কিন্তু সেই ছোট্ট মেয়ে নীলুর মনে একটুও আনন্দ নেই। কেউ যে তাকে বলতে পারল না, কোথায় পাওয়া যাবে

দাদুর জন্য একমুঠো বাতাস। মন খারাপ করে মেয়ে চলল বাড়ির পথে।

পথেই দেখা হলো দাদুর সাথে। দাদু বেরিয়েছিল তাকে খুঁজতে। দাদুকে বলল, দাদু আমি তোমার জন্য বাতাস যোগাড় করতে পারলাম না গো। দাদু বলল, কে বলল তুমি আমার জন্য বাতাস আনতে পারোনি?

আমি তো এখন দিব্যি শ্বাস নিতে পারছি এবং সে বাতাসটা তুমিই যোগাড় করেছ দাদু ভাই।

পথে বুড়ো বটগাছ আমাকে সব বলেছে। কীভাবে তুমি বুড়ো বটকে জল দিয়ে বাঁচিয়েছ, তারপর একে একে লম্বা তালগাছ এবং চারাগাছকেও জল দিয়ে সতেজ করেছ। তাই তারাও এখন নির্মল বাতাস দিচ্ছে। তাদের দেওয়া সেই বাতাসই তো আমরা অক্সিজেন হিসেবে গ্রহণ করি।

দাদু ভাই আজ তুমি গাছদের সাথে সাথে আমার প্রাণও বাঁচিয়েছ। এভাবেই আমরা জল, সার এবং যত্ন দিয়ে গাছ বাঁচাবো এবং পরিবেশকে রাখব নির্মল ও সুন্দর। ❑

---

শিশুসাহিত্যিক

# এভারেস্ট জয়ী ৭ বাংলাদেশি

## মো. মাহবুব আলম

পৃথিবীর সর্বোচ্চ এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গে উঠা ও নিজের দেশের পতাকা তুলে ধরতে পারা সে যেন ভিন্নরকম এক অনুভূতি। নেপালের পর্বতারোহী তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারি ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে যৌথভাবে সর্বপ্রথম এভারেস্ট পর্বত জয় করেন। কিন্তু তখনো কি কেউ ধারণা করেছিল, একদিন পৃথিবীর সর্বোচ্চ এ পর্বতশৃঙ্গে বাংলাদেশের পতাকা উড়বে? সেই ধারণাকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশিরাও এভারেস্ট জয় করেছেন। তুলে ধরছেন লাল-সবুজের পতাকা। তাদের এ কীর্তি দেশের জন্য এক গৌরবের ইতিহাস। একে একে সাতজন বাংলাদেশি এভারেস্টের চূড়া ছুঁয়েছেন। তাদের কথাই জানাবো নবারুণ বন্ধুদের–

### মুসা ইব্রাহিম

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী। পেশায় একজন সাংবাদিক ও পর্বতারোহী। ২০১০ সালের ২৩শে মে বাংলাদেশ সময় সকাল ৫টা ১৬ মিনিটে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন এবং লাল-সবুজ পতাকা ওড়ান। পর্বত বিজয়ী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম উঠে আসে তার হাত ধরেই। তার জন্ম ১৯৭৯ সালে লালমনিরহাট জেলার মোগলহাটে। তিনি ঠাকুরগাঁও চিনিকল উচ্চ বিদ্যালয়, নটরডেম কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। এছাড়া মুসা ২০১১ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত কিলিমাঞ্জারোর চূড়াও জয় করেন।

### এম এ মুহিত

২০১১ সালের ২১শে মে এভারেস্ট জয় করেন মোহাম্মদ আবদুল মুহিত। তিনি সবার কাছে পর্বতজয়ী এম এ মুহিত নামে পরিচিত। এছাড়া ২০১২ সালে মুহিত আরো একবার এভারেস্ট জয় করেন। তিনিই একমাত্র বাংলাদেশি, যিনি দু'বার এভারেস্ট জয় করেছেন। মুহিত ২০১০ সালে এভারেস্ট অভিযানে গেলেও বিরূপ আবহাওয়ার কারণে সে সময় ব্যর্থ হন। তার জন্ম ১৯৭০ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার গঙ্গাপুরে। তিনি ঢাকার

পোগোজ স্কুল, নটরডেম কলেজ ও ঢাকা সিটি কলেজে পড়াশোনা করেন।

এছাড়াও তিনি ২০০৯ সালে এভারেস্ট থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বিশ্বের ষষ্ঠ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ চো ওয়ো (৮,২০১ মিটার) জয় করেন। বাংলাদেশি পর্বতারোহীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ সাফল্য অর্জন করেছেন

**নিশাত মজুমদার**

প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন নিশাত মজুমদার। তিনি ২০১২ সালের ১৯শে মে সকাল সাড়ে ৯টায় এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন। তার জন্ম ১৯৮১ সালের ৫ই জানুয়ারি লক্ষ্মীপুরে। তিনি ঢাকার ফার্মগেটের বটমূলী হোম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ এবং ঢাকা সিটি কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন। মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ী নারীদের তালিকায় প্রথমবারের মতো তালিকাভুক্ত বাঙালি নারী হিসেবে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেন নিশাত।

এছাড়াও তিনি ২০০৯ সালের এপ্রিলে পৃথিবীর পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ মাকালুতে (২৭ হাজার ৮৬৫ ফুট) ভারত-বাংলাদেশ যৌথ অভিযানে অংশ নেন। এছাড়া তিনি বিএমটিসি আয়োজিত হিমালয়ের চেকিগো নামের একটি শৃঙ্গেও সফল অভিযানে যান।

**ওয়াসফিয়া নাজরীন**

দ্বিতীয় বাংলাদেশি নারী হিসেবে এভারেস্ট জয়ী ওয়াসফিয়া নাজরীন। তিনি ২০১২ সালের ২৬শে মে সকাল পৌনে ৭টায় বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন। তিনি ১৯৮২ সালের ২৭শে অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার স্কলাসটিকা স্কুল ও যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় এগনেস স্কট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। এছাড়াও স্টুডিও আর্ট বিষয়ে স্কটল্যান্ডে পড়াশোনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম পর্বতারোহী হিসেবে সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছেন। ওয়াসফিয়া নাজরীনকে দুঃসাহসী অভিযানের জন্য ২০১৪ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির বর্ষসেরা অভিযাত্রীর খেতাব দেওয়া হয়।

**খালেদ হোসেন**

এভারেস্ট জয়ী খালেদ হোসেন বেশি পরিচিত সজল খালেদ নামে। নেপালের সাউথ ফেস দিয়ে ২০১৩ সালের ২০শে মে সকাল আনুমানিক ১০টায় এভারেস্ট জয় করেন। কিন্তু এভারেস্ট জয় করে নেমে আসার পথে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এভারেস্ট জয়ী মৃত্যুবরণকারী প্রথম বাংলাদেশি। তার জন্ম ১৯৭৯ সালের মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার আটপাড়া ইউনিয়নের সিংপাড়া হাসারা গ্রামে। শিক্ষাজীবনে তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে স্নাতক এবং ফিল্ম স্টাডিজে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও তিনি চলচ্চিত্রকার হিসেবেও কাজ করেছেন।

**বাবর আলী**

দীর্ঘ ১১ বছর পর ষষ্ঠ বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন চট্টগ্রামের বাবর আলী। বাবর আলী ২০২৪ সালের ১৯শে মে বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে এভারেস্টের চূড়া স্পর্শ করেন। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে চিকিৎসা পেশায় যুক্ত হলেও তাতে থিতু হননি। এভারেস্ট জয়ের আগে বাবর আলী ৯টি পর্বতের চূড়ায় উঠেছেন।

**ইকরামুল হাসান শাকিল**

সপ্তম বাংলাদেশি হিসেবে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছেন ইকরামুল হাসান শাকিল। তিনি ২০২৫ সালের ১৯শে মে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান। তিনি 'সি টু সামিট' অভিযানে কম সময়ের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এভারেস্টের শিখরে পৌঁছে বিশ্ব রেকর্ড করেন। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের ইনানী সৈকত থেকে সি টু সামিট অভিযানে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের প্রায় ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছান। এছাড়াও এর আগে তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে গ্রেট হিমালয়ান ট্রেইলে ট্রেকিং শেষ করেন।

# বজ্রপাতে করণীয়

## রেজাউল করীম

আমাদের দেশে বজ্রপাত বর্তমান সময়ে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বজ্রপাতের নির্দিষ্ট কোনো সময় না থাকলেও ঝড়বৃষ্টির সময়ই সাধারণত বজ্রপাত হয়। এপ্রিল থেকে জুন বা বাংলা চৈত্র থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত সময়ে বজ্রপাত বেশি হয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বজ্রপাত ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। বজ্রপাতের ফলে প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে বজ্রপাতে প্রাণহানি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। জেনে নেওয়া যাক বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকার কিছু উপায়–

* হঠাৎ বজ্রঝড় শুরু হলে তখন বাইরে অবস্থান করা যাবে না। যদি জরুরি কাজে ঘরের বাইরে থাকলেও অবশ্যই নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

* গভীর ও উলম্ব আকৃতির মেঘ দেখলেই বুঝতে হবে বজ্রঝড় হতে পারে। যদি জরুরি প্রয়োজন তাহলে বাইরে যেতে হলে রাবারের জুতা পরে বেরোবেন।

* গ্রামের মাঠে অবস্থান করলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে যেতে হবে। বজ্রপাতের সময় এভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত।

* যদি আপনার ভবনে বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে বজ্রঝড়ের সময় সবাই আলাদা আলাদা কক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করতে হবে।

* বজ্রপাতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যদি কেউ আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বজ্রপাতে আক্রান্ত হলেই সবাই তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায় এমন না। তাই আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত নিকটস্থ চিকিৎসাকেন্দ্রে নিতে হবে। বজ্রপাতে কেউ আহত হলে ওই ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

**বজ্রপাতের সময়ে সতর্কতামূলক কয়েকটি পরামর্শ**

* ঘন ঘন বজ্রপাত হতে থাকলে কোনো অবস্থাতেই খোলা বা উঁচু স্থানে থাকা যাবে না। সবচেয়ে ভালো হয় কোনো একটি পাকা দালানের নিচে আশ্রয় নিতে পারলে।

* বৈদ্যুতিক খুঁটি ও খোলা স্থানে বিচ্ছিন্ন যাত্রী ছাউনি, তালগাছ বা বড়ো গাছগুলোতে বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই ওই স্থানে আশ্রয় নেওয়া যাবে না।

* বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি যাওয়ার দরকার নাই। জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভেতর থাকুন।

* বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির রেলিং ও পাইপ থেকে দূরে থাকতে হবে। এমনকি মোবাইল ফোনে কথা বলা এবং ল্যান্ড লাইন টেলিফোনও স্পর্শ না করাই ভালো। বজ্রপাতের সময় এগুলো স্পর্শ করেও অনেক মানুষ আহত হয়।
* বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক সংযোগযুক্ত সব যন্ত্রপাতি স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন। বজ্রপাতের আভাস পেলে আগেই এগুলোর প্লাগ খুলে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
* এ সময় গাড়ির ভেতরে থাকলে সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। গাড়ির ভেতরের ধাতব বস্তু স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। গাড়ির কাচেও হাত দেওয়া যাবে না।
* বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা বড়ো মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে যেতে হবে। বাড়ির ছাদ বা উঁচু কোনো স্থানে থাকলে দ্রুত সেখান থেকে নেমে যেতে হবে। এসময় শিশুদের বাইরে খোলা মাঠে খেলতে যেতে দেওয়া যাবে না।
* বজ্রপাতের সময় আপনি ছোটো কোনো পুকুরে সাঁতার কাটা বা জলাবদ্ধ স্থানে থাকা অবস্থায় যদি বজ্রপাত হয় তাহলে সেখান থেকে সরে পড়ুন। পানি খুব বেশি বিদ্যুৎ পরিবাহী।
* বজ্রপাতের সময় চামড়ার ভেজা জুতা বা খালি পায়ে থাকা খুবই বিপজ্জনক। এ সময় বিদ্যুৎ অপরিবাহী রাবারের জুতা সবচেয়ে নিরাপদ।
* বজ্রপাত থেকে নিরাপদ রাখতে হলে বাড়ি নির্মাণের সময় আর্থিং সংযুক্ত রড বাড়িতে স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিতে হবে। ভুলভাবে স্থাপিত রড বজ্রপাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে।
* বজ্রপাতের সময় কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। একইসঙ্গে বজ্রপাতে আহত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকলে সহজে এর প্রতিকার পাওয়া যাবে।

এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। এ সময় বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সর্তকতা অবলম্বন করুন।

যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।

আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন।

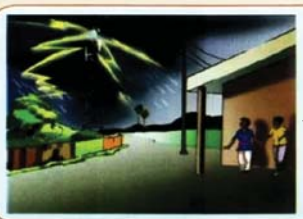

উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।

বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থান বা জলাশয়ে অথবা জলাশয়ের অতি নিকটে থাকবেন না।

বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতরে অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।

# গ্রীষ্মকালীন রোগে সাবধানতা

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে আমরা বড়োরা নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে অনেক কিছু করি। যেমন ঘন ঘন চোখে মুখে পানির ঝাপটা দেই। বেশি বেশি পানি পান করি, রোদে গেলে ছাতা ও সানগ্লাস ব্যবহার করি। কিন্তু শিশুরা তা প্রকাশ করতে পারে না। তাই গরমের সময় শিশুদের বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে সুরক্ষিত রাখতে বড়োদের শিশুদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। এসময় শিশুদের কোন কোন রোগ হতে পারে তা দেয়া হলো-

### ঘামাচি

গরমকালে শিশুর শরীরে ঘামাচি হতে পারে। সেজন্য প্রতিদিন গোসল করিয়ে পরিষ্কার সুতির পোশাক পরাতে হবে। ঘামে ভেজা শরীর মুছে দিয়ে কাপড় বদলানো উচিত। ঘামাচির জায়গায় শিশুদের উপযোগী পাউডার ব্যবহার করতে হবে। গরমে শিশুকে বেশিক্ষণ ডায়াপার না পরিয়ে রাখাই ভালো।

### জ্বর

বিভিন্ন কারণে জ্বর হতে পারে। বিভিন্ন ভাইরাস সংক্রমণজনিত জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, হাম ও জলবসন্ত, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, প্রস্রাবের সংক্রমণ ইত্যাদি। তবে এ সময়ে সাধারণত ভাইরাস জ্বরের প্রকোপ বেশি হয়। জ্বর হলে প্রাথমিকভাবে পানি দিয়ে স্পঞ্জিং করা উচিত। রোগীকে ফ্যানের বাতাসের নিচে রাখুন। খাবার স্যালাইন, ফলের রস, শরবত ইত্যাদি তরল খাবার বেশি বেশি খাওয়াতে হবে। অন্যান্য খাবার স্বাভাবিক নিয়মে চলবে।

### সর্দি-কাশি

গরমে শিশুদের ক্ষেত্রে ঠান্ডার সমস্যাটা বেশি হতে দেখা যায়। গরমে অতিরিক্ত ঘামের ফলে ঠান্ডা লেগে শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ ও নিউমোনিয়া হতে পারে। শিশুদের সংক্রমণের ফলে শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ ও নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট নাও হতে পারে। শিশুর শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ হলো- জ্বর, ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসের সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দ, বুকের পাঁজর বা খাঁচা ডেবে যাওয়া, খেতে না পারা বা খাওয়ানোতে অসুবিধা হওয়া, দুর্বলতা ও ক্লান্তিভাব।

### ডায়রিয়া

গরমের সময় শিশুদের ডায়রিয়া হয়ে থাকে। এতে শরীর থেকে প্রচুর পানি ও খনিজ লবণ বের হয়ে যায়। তাই ডায়রিয়া হলে তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো বয়স অনুযায়ী পরিমাণমতো স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

### হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া

প্রচণ্ড গরমে শিশু মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা হিট স্ট্রোকও হতে পারে। পানিশূন্যতা হলে, রক্তে সুগার কমে গেলে বা ব্লাড পেশার কমে গেলে শিশু অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় আতঙ্কিত না হয়ে একদিকে কাত করে দিতে হবে, যাতে মুখের লালা বেরিয়ে আসতে পারে। শোয়ানোর পর দুই পায়ের দিক মাথার চেয়ে কিছুটা উঁচু করে রাখতে হবে। পোশাক ঢিলা করে দিতে হবে। ঘাড়ের নিচে উঁচু কিছু রেখে মাথাটা নিচে নামিয়ে থুতনি উপরে রাখতে হবে, যাতে শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলে বাধা তৈরি না হয়। তারপর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সবশেষে নবারুণের বন্ধুরা, তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

*প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন*

# গরবিনি মা সম্মাননা

রাষ্ট্র ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিদের পেছনে থাকে কারো না কারো ত্যাগ, শ্রম ও অনুপ্রেরণা। আর মা হচ্ছেন সেই ত্যাগ, শ্রম আর অনুপ্রেরণার নাম। মায়েদের এই অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ বছর গরবিনি মা সম্মাননা পেয়েছেন ১২জন মা। প্রতি বছর মা দিবসকে উপলক্ষ্য করে এই সম্মাননা দিয়ে আসছে রাজধানীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

১১ই মে মহাখালীর রাওয়া কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'গরবিনি মা-২০২৫' সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় সেই গরবিনি ১২ মায়ের হাতে।

সম্মাননা পাওয়া মায়েরা হলেন- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজের মা মনোয়ারা বেগম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ২-এর বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ রেজাউল করিমের মা রেজীয়া বেগম, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খানের মা রেজিয়া খাতুন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখার মা আয়েশা আক্তার, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপপুলিশ কমিশনার কাজী নুসরাত এদীবের মা ফরিদা আফরোজা, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের চেয়ারম্যান সরদার এ নাঈমের মা রাজিয়া কাদের, প্রকৌশলী এ কে এম সাইফুল বারির মা হাজেরা বেগম, বেসরকারি টেলিভিশন বাংলাভিশনের ডেপুটি হেড অব নিউজ মো. মাহফুজুর রহমানের মা রাজিয়া খাতুন, সংগীতশিল্পী দিলশাদ নাহার কনার মা লুৎফুন্নাহার লুৎফা, অভিনেত্রী সুমাইয়া শিমুর মা লায়লা রহমান, অভিনেতা আবদুন নূর সজলের মা কানিজ ফাতেমা এবং ব্র্যাক ব্যাংক-প্রথম আলো ট্রাস্ট অদম্য মেধাবী তহবিল থেকে শিক্ষাবৃত্তিপ্রাপ্ত বর্ষা রানীর মা শ্রীমতী শৈল বালা।

অনুষ্ঠানে মায়ের স্মৃতি মনে করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধান অতিথি শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। নিজের হাতের ওপর মায়ের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'মা বেঁচে থাকলে আজকে আমার জন্য গর্ববোধ করতেন। জীবনের যত অর্জন আছে, তার সবটাই মায়ের দোয়ায় পেয়েছি।'

প্রতিটি দিনকে মা দিবস উল্লেখ করে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নাজমুল হোসেন বলেন, 'মাতৃত্বের বিজয় সার্বিক। আমি যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়তাম, তখন ৩০ শতাংশ মেয়ে ছিল। কিন্তু সর্বশেষ মেডিক্যাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬৩ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী। নারীরা এখন এগিয়ে যাচ্ছেন।' উল্লেখ্য, ২০১৪ সাল থেকে এই সম্মাননা দিয়ে আসছে ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

*প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী*

# পাখিদের দ্বীপ

## নাহিদ ইয়াছমিন লাইজু

পৃথিবীতে রয়েছে নানান ধরনের দ্বীপ। কিন্তু তোমরা কি জানো, পাখিদেরও নিজস্ব দ্বীপ আছে? আজ এমন এক দ্বীপের কথা জানাবো তোমাদের। এই দ্বীপে পাখিরা দূরদূরান্ত থেকে উড়ে এসে আবাস গড়ে। আর সেই দ্বীপের রূপে মুগ্ধ হয়ে বহুদূর পাড়ি দিয়ে আবাস গড়েছে মানুষ। দ্বীপটির নাম গ্রিমসে। এই দ্বীপে পাখির সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ। আর কিচিরমিচিরে মুখর দ্বীপটিতে বর্তমানে মানুষের সংখ্যা মাত্র ২০! আইসল্যান্ডের উত্তর উপকূল থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে এই দ্বীপ অবস্থিত। ইউরোপের সবচেয়ে দূরবর্তী জনবসতির দ্বীপ গ্রিমসে।

৬ দশমিক ৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের হিমশীতল দ্বীপ গ্রিমসে আইসল্যান্ডের সবচেয়ে উত্তরের জনবসতিপূর্ণ এলাকা। এটি আর্কটিক সার্কেলের মধ্যে অবস্থিত আইসল্যান্ডের একমাত্র অংশ। এ কারণে পাখিপ্রেমী পর্যটকদের কাছে ভ্রমণের জন্য দ্বীপটি বেশ আকর্ষণীয়। এছাড়া প্রতি তিন সপ্তাহে একবার উড়োজাহাজে করে একজন চিকিৎসক এই দ্বীপে আসেন। পর্যটকেরা বিপুল ও বিচিত্র সামুদ্রিক পাখি ও বন্যপ্রাণী দেখতে আগ্রহী। গ্রিমসেতে কমলা ঠোঁটের পাফিন পাখির সংখ্যাই বেশি। এছাড়া এ দ্বীপটিতে আরো রয়েছে কালো পায়ের কিটিওয়াকস, রেজারবিল ও গিলেমোটস পাখির আবাসস্থল। এসব সামুদ্রিক পাখি দেখতে অপূর্ব সুন্দর। দ্বীপজুড়ে আইসল্যান্ডিক ঘোড়া ও ভেড়ার বিচরণও আছে।

প্রকৃতি এখানে খুব শক্তিশালী। শীতের রাতে অন্ধকারের পাশাপাশি এখানে মায়াবি রহস্যময় আলোর ঝলকানি দেখা যায়। এর প্রভাবে পৃথিবীর কিছু অঞ্চল থেকে আকাশে চমৎকার সবুজ আভা দেখা যায়। আর বসন্তে আসে আলো ও পাখি। এখানে প্রতিটি ঋতুই বিশেষ কিছু। দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছোটো ছোটো বেশ কয়েকটি বাড়ি আছে। একটি রেস্তোরাঁ, একটি সুইমিংপুল, লাইব্রেরি, গির্জা ও একটি উড়োজাহাজ অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য ছোট্ট এক এয়ারস্ট্রিপসহ, পাখিদের বসার জন্য বিশাল জায়গা আছে দ্বীপটিতে। আইসল্যান্ডের অনেক ছোটো শহর এবং গ্রামের মতোই গ্রিমসেরও একটি ইতিহাস আছে। এই দ্বীপের নাম গ্রিমুর নামের একজন বসতি স্থাপনকারীর নামের সঙ্গে মিল রেখে রাখা হয়েছে। গ্রিমুর, যিনি পশ্চিম নরওয়ের সোগন জেলা থেকে প্রথমে এই দ্বীপে যাত্রা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে বাসিন্দাদের কাছে গ্রিমসের জমির মালিকানা আছে। তাঁরাই মূলত এ দ্বীপটি সংরক্ষণের কাজ করে যাচ্ছেন। এ যেন পাখির রাজ্যে মানুষ প্রজার মতো। এই ঘাসযুক্ত দ্বীপের খাড়া পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো, হাজার হাজার সামুদ্রিক পাখি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের গভীর প্রশান্তি অনুভব করার মধ্যে সত্যিই ব্যতিক্রম কিছু আছে। ❑

---

তথ্যসূত্র: বিবিসি ও আইসল্যান্ড রিভিউ

# ১২ জনের ১ জনই বাংলাদেশি

পৃথিবীর নানা প্রান্তে বাংলাদেশিরা বসবাস করছেন। তবে আজ যে মজার তথ্যটি জানাবো তা হলো ওশেনিয়ার ছোট্ট একটি দ্বীপদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের চমকপ্রদ সম্পর্ক। পালাউ হলো প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ওশেনিয়ার ছোট্ট একটি দ্বীপদেশ। এই স্বাধীন দেশটি আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য অসাধারণ। স্বচ্ছ নীল জলরাশি, প্রবালপ্রাচীর এবং বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের কারণে এটি বিশ্বের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। মজার তথ্যটি হলো, পালাউ-এর মোট ২৪,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ২,০০০ জনই বাংলাদেশি। অর্থাৎ, প্রতি ১২ জনের মধ্যে ১ জনই বাংলাদেশি! মূলত পর্যটন, ব্যাবসা এবং বিভিন্ন শ্রমশক্তির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশিরা এখানে বসবাস করছেন এবং পালাউ-এর অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

পালাউ-এ ৩৪০টি ছোটো-বড়ো দ্বীপ রয়েছে। এর মধ্যে আটটি প্রধান দ্বীপ এবং ২৫০টিরও বেশি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপদেশ বিশ্বের অন্যতম সেরা স্কুবা ডাইভিং গন্তব্য হিসেবেও পরিচিত। পালাউ-এর উপকূলে প্রায় ১৩০ প্রজাতির হাঙর পাওয়া যায়। এখানকার এক বিশেষ হ্রদে লাখ লাখ জেলিফিশ ভেসে বেড়ায়। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পালাউকে বিশ্বের অন্যতম পরিবেশবান্ধব দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থনৈতিকভাবে পালাউ বেশ সমৃদ্ধ। এখানকার আয়ের প্রধান উৎস পর্যটন শিল্প। এছাড়াও, কৃষিকাজ এবং মাছ ধরা এখানকার মানুষের অন্যতম জীবিকা। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে পালাউ বৈচিত্র্যময়। এর সরকারি ভাষা পালাউন এবং ইংরেজি। প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য পালাউ যেন এক স্বর্গরাজ্য, যেখানে বাংলাদেশের নামও বিশেষভাবে উচ্চারিত হচ্ছে! এই ছোট্ট দ্বীপদেশে বাংলাদেশিদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি একদিকে যেমন আমাদের শ্রমশক্তির ব্যাপক বিস্তারের ইঙ্গিত দেয়, তেমনি বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের গুরুত্বকেও তুলে ধরে।

# বইসেতু

বইসেতু! সেটা আবার কী? কীভাবে তৈরি হলো? এমন নানান প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোমাদের মনে। আসলে 'বইসেতু' বানিয়ে পুরোনো দোকান থেকে নতুন দোকানে নেওয়া হয়েছে বই। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের একটি ছোট্ট শহরের প্রায় ৩০০ মানুষ একজনের পর একজন দাঁড়িয়ে এই সেতু তৈরি করেন। এভাবে ওই সেতু দিয়ে নতুন দোকানে নেওয়া হয়েছে প্রায় ৯ হাজার ১০০টি বই! পুরোনো দোকান থেকে নতুন দোকানে বইগুলো সরাতে সময় লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটি। স্থানীয় বাসিন্দারা চেলসি শহরের একটি হাঁটাপথের দু'পাশের দুই সারিতে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে বইগুলো পুরোনো দোকান থেকে সরাসরি নতুন দোকানের তাকে ঠিকঠাকমতো সাজিয়ে দেন।

দোকান থেকে বই সরিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো কোম্পানিকে ভাড়া করলে বই বাক্সবন্দি করা, সেগুলো নিয়ে নতুন দোকানে গিয়ে বাক্স খুলে বই সাজাতে আরও অনেক বেশি সময় লাগত।

বই বহনের জন্য তৈরি করা মানবসেতুর লোকজন শুধু এক দোকান থেকে আরেক দোকানে বই নিয়েই যাননি, তারা নতুন দোকানে 'বর্ণানুক্রমে' বইগুলো তাকে সাজিয়েও দিয়েছেন। এক বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে ওই বইয়ের দোকানে কাজ করেন কেছি ফ্রিস নামের এক নারী। তিনি বলেন, 'এটি খুবই ছোটো শহর এবং এখানকার বাসিন্দারা একে অপরের খেয়াল রাখেন। যেখানেই যাবেন, আপনি চেনা কাউকে না কাউকে দেখতে পাবেন অথবা কেউ না কেউ আপনাকে চিনতে পারবেন এবং আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করবেন।' ফ্রিসের কাছে তার শহর ও শহরের মানুষেরা সত্যিই বিশেষ।

প্রতিবেদন: ফাতেমা জেসমিন রীমা

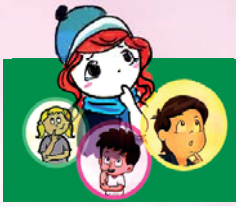

# বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

## শব্দধাঁধা

**পাশাপাশি:** ১. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, ৪. আকাশ, ৬. সময়ের ক্ষুদ্রাংশ, ৯. অকৌতূহলী, ১০. দেহাংশ, ১১. মিথ্যা উক্তি

**উপর-নিচ:** ১. সমাপ্তি, ২. মন, ৩. স্বর্গ, ৫. একই ধ্বনি বা বর্ণের পুনঃপুন প্রয়োগ, ৭. হরিণের চামড়া, ৮. আঙিনা

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | | | | ■ | ২. | ■ | ৩. |
| | ■ | ■ | ■ | ৪. | | | |
| | ■ | ■ | ৫. | ■ | | ■ | |
| | ■ | ৬. | | | | ■ | |
| ■ | ৭. | ■ | | ■ | ■ | ৮ | |
| ৯. | | | | ■ | ১০. | | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | ■ | ১১. | | | | ■ | ■ |

## ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯ | + | | - | ৪ | = | |
| / | ■ | * | ■ | - | ■ | + |
| | * | ২ | + | | = | ৭ |
| + | ■ | + | ■ | + | ■ | + |
| ৪ | * | | - | ৫ | = | |
| = | ■ | = | ■ | = | ■ | = |
| | + | ৫ | + | | = | ২০ |

## ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

**সংকেত:** প্রধান উপদেষ্টা, আয়ত, অবনমন, অভূতপূর্ব, রজনী, মা

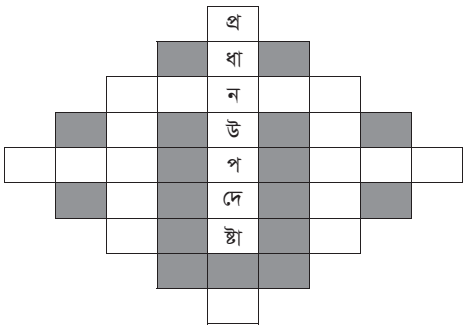


## নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫৩ | | | | ৪৭ | | ৫ | | ৩ |
| | ৫৭ | | ৪৯ | | ৪৫ | | ৭ | |
| ৫৫ | | ৫৯ | ৪২ | | ৪৪ | ৯ | | ১ |
| | ৬৩ | | | ৩৮ | | | ১৫ | |
| ৬৫ | | ৬১ | | ৩৯ | ৩৬ | | ১৪ | ১৭ |
| | ৭৭ | | ৭৫ | | ৩৫ | ১২ | | |
| | ৭৮ | ৮১ | | ৩৩ | | ২৭ | ২৬ | |
| | | | ৭৩ | | ২৯ | | ২৫ | |
| ৬৯ | | | ৭২ | ৩১ | | ২৩ | | ২১ |

# এপ্রিল মাসের সমাধান

## শব্দধাঁধা

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জ | ব্বা | রে | র | ব | লি | খে | লা |
| ন | | | | | টা | | ল |
| নী | লা | ম্ব | রী | | র | স | ন |
| | | | | | | র | |
| বৈ | প | রী | ত্য | | ম | গ | জ |
| শা | | তি | | দ | | র | |
| খ | ড় | ম | | র | | ম | |
| | | ত | র্ক | জা | ল | | |

## ছক মিলাও

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আ | | | | |
| | | | কা | ন | ন | | | |
| | | | | ন্দ | | | | |
| | | বা | | শো | র | গো | ল | |
| আ | | ন | ন্দ | স | ভা | | বে | |
| | | র | | | যা | | চা | ল |
| | | | সু | মা | ত্রা | | রা | |
| | | | | ন | | | | |

## ব্রেইন ইকুয়েশন

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ | * | ৪ | + | ৩ | = | ৫ |
| + | | * | | + | | + |
| ২ | * | ১ | + | ৪ | = | ৬ |
| - | | - | | * | | + |
| ৬ | - | ২ | * | ১ | = | ৪ |
| = | | = | | = | | = |
| ৪ | * | ২ | + | ৭ | = | ১৫ |

## নাম্ব্রিক্স

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫৩ | ৫২ | ৫১ | ৫০ | ৪৭ | ৪৬ | ৯ | ৮ | ৭ |
| ৫৪ | ৫৯ | ৬০ | ৪৯ | ৪৮ | ৪৫ | ১০ | ১১ | ৬ |
| ৫৫ | ৫৮ | ৬১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ১৩ | ১২ | ৫ |
| ৫৬ | ৫৭ | ৬২ | ৪১ | ৩৮ | ৩৭ | ১৪ | ৩ | ৪ |
| ৭৫ | ৭৬ | ৬৩ | ৪০ | ৩৯ | ৩৬ | ১৫ | ২ | ১ |
| ৭৪ | ৭৭ | ৬৪ | ৬৫ | ৩৪ | ৩৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ৭৩ | ৭৮ | ৮১ | ৬৬ | ৩৩ | ২৮ | ২৭ | ২৬ | ১৯ |
| ৭২ | ৭৯ | ৮০ | ৬৭ | ৩২ | ২৯ | ২৪ | ২৫ | ২০ |
| ৭১ | ৭০ | ৬৯ | ৬৮ | ৩১ | ৩০ | ২৩ | ২২ | ২১ |

শোয়েব হোসেন, চতুর্থ শ্রেণি, জয়পুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর

আবু সালেহ, ষষ্ঠ শ্রেণি, মোহাম্মদপুর বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

তাসনিম জাহান রাদিয়া, তৃতীয় শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর

মোহাম্মদ ইউসুফ অর্ক, পঞ্চম শ্রেণি, জুনিয়র এইড স্কুল, যাত্রাবাড়ি

মো. রাকিবুল ইসলাম, অষ্টম শ্রেণি, দেওয়ান পাড়া হাই স্কুল, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি

সিরাজুম মুনিরা বিভা, দ্বিতীয় শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

সাইমুম আহমেদ, ষষ্ঠ শ্রেণি, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ডেমরা, ঢাকা

নুহা আলম, ষষ্ঠ শ্রেণি, খিলগাঁও মডেল হাই স্কুল, ঢাকা

রোজমিলা রহমান, দশম শ্রেণি, একরামুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয়, রামপুরা, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-11. May 2025, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

রুমাইজা শারওয়াত, সপ্তম শ্রেণি, শহিদ আনোয়ার গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

**চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**
**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়**
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা